দুজনার ঘর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

আকাঙ্ক্ষা......2
তপ......29
তিলে তিলে তিলোত্তমা......53
তৃষ্ণা......65
দুজনার ঘর......79
বিবেচনা সাপেক্ষ......98
মেজর সেবকরাম......124
সৈনিক......135

www.bengaliebook.com

আকাঙ্ক্ষা

এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা গৌরকিশোর অধিকারীর। বন্ধ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন আর গৌরকিশোর মস্ত ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলতে গাড়িটা একটা বাসের পিছনে দাঁড়িয়ে গেছল। বন্ধুই তাঁকে প্রথম দেখেছেন, তারপর না চেনার মত করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু গৌরকিশোর তাকে দেখামাত্র উৎফুল্ল। ড্রাইভার তাঁর ইঙ্গিতে গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে বাঁয়ের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করিয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে তিনি বন্ধুকে ধরেছেন। তাকে জাপটে ধরে টেনে এনে গাড়িতে তুলেছেন। তারপর সানন্দে বলে উঠেছেন, ভাগ্যিস দেখেছিলাম, তুই তো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিলি!

বন্ধু জবাব দিয়েছেন, তোমাকে আর তোমার গাড়ি দেখে মুখ ফিরিয়েছিলাম –

কেন, কেন? গৌরকিশোরবাবু ঈষৎ- অপ্রস্তুত।

–সংকোচে আর হিংসেয়।

গৌরকিশোরবাবু হা-হা শব্দে হেসে উঠেছেন। তকমা আর টুপী পরা ড্রাইভার সচকিত হয়ে সামনের আয়না দিয়ে তাঁর মুখ দেখতে চেষ্টা করেছে। গাড়ি সামনের রাস্তা ধরে চলেছে।

বন্ধুর জবাব শুনে বেশ মজার খোরাক পেয়েছেন গৌরকিশোরবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, সংকোচ কিসের আর হিংসেই বা কেন?

ড্রাইভারকে বাঙালী মনে হয়নি বন্ধুর। তাই গলার স্বর স্বাভাবিক রেখেই জবাব। দিলেন, সংকোচ তোমার অবস্থান্তর দেখে আর হিংসে তোমার স্ত্রী-ভাগ্য দেখে।

গৌরকিশোরবাবুর মুখে হাসি ধরে না।–এই দুটো ব্যাপারই যে অবশ্যম্ভাবী সে তো তুই হাত দেখে আর কুষ্টি দেখে অনেক আগেই বলে দিয়েছিলি!

www.bengaliebook.com

-তা বলেছিলাম হয়ত, কিন্তু গণনা করা আর স্বচক্ষে তার সফল রূপ দেখার মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আর অভাজনদের কিছু কিছু উক্তি কানে এসেছে, যার ফলে তোমাকে দেখামাত্র ওই তফাৎটা চোখ ধাঁধিয়েছে।

হাসিমুখে গৌরকিশোরবাবু বন্ধুর গন্তব্যস্থল জেনে নিলেন। বাড়ি যাচ্ছেন শুনে খুশিমনে তাকে পৌঁছে দিতে চললেন। আপাতত তিন-কোয়ার্টার ফ্রী তিনি, অতএব বন্ধুর বাড়িতে দশ বিশ মিনিট বসে একটু আড্ডা দেবারও সময় হবে। তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, অভাজনদের আবার কি উক্তি কানে এলো তোমার?

সুবিনয় দাশগুপ্ত বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেছল, তুমি ব্যস্ত ছিলে বলে তাকে বসতেও বলোনি, এগিয়ে এসে দুই এক কথা বলে সিঁড়ি থেকেই তাকে বিদায় করেছ।

-ও হ্যাঁ, সেদিন স্ত্রীর কয়েকজন বন্ধু আর বান্ধবী এসেছিলেন, কি একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চলছিল।

–আর মাস ছয় আগে এক বৃষ্টির দিনে তোমার গাড়ি ট্রামের পাশ কাটাতে গিয়ে ফুটপাতে অমল ঘোষের জামাকাপড় রাস্তার জলে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেছল। তুমি তাকে দেখেছিলে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলে।

গৌরকিশোরবাবু একটুও চিন্তা না করেই মাথা নাড়লেন।জলের ধারে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায় কেউ? বেচারার কোমর পর্যন্ত ভিজে সারা!…গাড়িতে সেদিন স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী শালা সবাই ছিলেন, সেদিনও এক বড় ইন্ডাসট্রিয়াল ম্যাগনেটের বাড়িতে পার্টি ছিল। তারপর, আর কিছু?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, আর কিছু না।

গৌরকিশোর অধিকারী হৃষ্টমুখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অবশ্যম্ভাবী অবস্থান্তর আর স্ত্রী-ভাগ্যের পরে আমার যে এরকম পরিবর্তন হবে হাত আর কুষ্ঠি দেখে সেটা বুঝি আঁচ করতে পারিসনি?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, পারেননি।

গৌরকিশোরবাবু ড্রাইভারকে দ্বিতীয় দফা সচকিত করে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।

বন্ধুর বাড়িতে এসে চা হল, গল্পগুজব হল খানিক। কথা বেশি গৌরকিশোরই বললেন। সামাজিকতা লৌকিকতার ঝামেলায় সময়ের অভাব কত কম, সরস হাসি মুখে সেই গল্প করলেন। শালার সঙ্গে নতুন স্টাল অ্যাও নেট অ্যায়ারিং-এর ব্যবসা কি রকম চলছে গম্ভীরমুখে সেই ফিরিস্তি দিলেন।

বন্ধুর শ্রোতার ভূমিকা।

শেষে হঠাৎ এক সময় হাত বাড়িয়ে দিলেন গৌরকিশোর অধিকারী, বললেন, আমার কুষ্ঠি তো তোর মুখস্থই ছিল–হাতের সঙ্গে মিলিয়ে আর একবার দ্যাখ দেখি-কলেজের মাস্টারি ছেড়ে এই ব্যবসায় নামলে তুই সত্যিই লাল হয়ে যেতিস!

হাতের ওপর হাত-দেখা কঁচ ফেলে বন্ধু গম্ভীর মুখে খানিক রেখা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানতে চাও, বলো।

-আমি বলব কি, তুই বল!

-তোমার সদ্য বর্তমানের আকাঙক্ষার স্বরূপ আমার জানা নেই, বলো কি জানতে চাও?

মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন গৌরকিশোর। হাসিটা কমে আসতে লাগল। চোখে চোখ রেখে চেয়েই রইলেন খানিক। তারপর সাদাসিধে স্পষ্ট গলাতেই জিজ্ঞাসা। করলেন, আমার স্ত্রীর চোখে কোনদিন জল দেখতে পাব?

এবার বন্ধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

গৌরকিশোরের মুখে হাসির ভাজ পড়তে লাগল আবার।–কি বলে তোমার গণনা, পাব?

বন্ধু মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, আমার জ্যোতিষী বিদ্যায় এটা বলা সম্ভব নয়।

গৌরকিশোর জোরেই হেসে উঠলেন এবারে। পরমুহূর্তে ঘড়ি দেখেই আঁতকে উঠলেন প্রায়, দেখেছ কাণ্ড! চলি ভাই

হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে চললেন তিনি।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন, তুরন্ত চলো–

গাড়ি ছুটল। অসহিষ্ণু অস্বস্তি নিয়ে হাত-ঘড়িটা দেখলেন আবার। স্ত্রীকে যেসময় দিয়েছিলেন তার থেকে সাত আট মিনিট দেরি হবেই পৌঁছুতে। গৌরকিশোরবাবুর চাপা অস্বস্তি সাত আট বছর দেরিতে পৌঁছুনোর মত। সময়ের হিসেব না থাকাটা কালচারের একটা বড় খুঁত।

সাত আট মিনিট নয়, দুমিনিট দেরি হয়েছে ফিরতে। স্ত্রী ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেছিলেন শুনলেন। তারপর একাই ডান্স-ড্রামা দেখতে চলে গেছেন। ....ঠিক এক মিনিট আগে।

.

তার একত্রিশ, লতার ছাব্বিশ।

গৌরকিশোর বিয়ে করেছেন পাঁচ বছর আগে। করেছেন বলা ঠিক হল না, তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বিয়েটা তার জীবনে এক অভাবিত ঘটনা। তিনি বাস্তববাদী মানুষ, জীবনে কোনদিন আকাশকুসুম কল্পনায় বিভোর হননি। কিন্তু বাস্তবের আকাশ থেকে তাঁর জীবনে ভাগ্যের এক দুর্লভ কুসুম খসে পড়েছে। বিয়ের পর নয়, বিয়ের প্রস্তাব শুনেই তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন।

www.bengaliebook.com

তাঁর বাবা ছিলেন বনেদী লোহার কারবারী চ্যাটার্জী মেটালস-এর পাঁচজন অ্যাকাউনটেন্ট-এর একজন। দুদুটো যুদ্ধের কল্যাণে চ্যাটার্জী মেটালস-এর ভাগ্য আর। খ্যাতির তুঙ্গস্থানে বৃহস্পতির অনড় অবস্থান। কিন্তু গৌরকিশোরের বাবা আনন্দকিশোর সচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন মাত্র মাসকতকের জন্যে। গৌরকিশোর বি. এ. পাশ করার পরে।

বিধাতার খেয়ালের কুল মেলা ভার। নইলে বলা নেই কওয়া নেই, গৌরকিশোরের অ্যাকাউনটেন্ট বাবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের খাস বেয়ারার মুখে বড়া সাব সেলাম দিয়া শুনে তো ঘামতে ঘামতেই ছুটেছিলেন তার এয়ার কনডিশল্ড চেম্বারের দিকে। মাঝে এক ঝুড়ি ছোট বড় হোমরাচোমরা অফিসারের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তাকে তলব কেন ভেবে না পেয়ে গলদঘর্ম অবস্থা। নমাসে ছমাসে ডাক যদি কখনো পড়ে তো আর পাঁচজন অফিসারের নির্দেশে তাদের সঙ্গ ধরে ঘরে ঢোকেন, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শোনেন, তারপর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে অফিসারদের ইঙ্গিত বুঝেই আবার বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। শুধু অফিসাররা কেন, ওই ঘর থেকে ডাক এলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বড় দুই ছেলে পর্যন্ত সভয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছোটেন-বাপের পরেই যাঁরা এত বড় কোম্পানীর হর্তাকর্তা।

সেই ঘর থেকে একা অ্যাকাউনটেন্টের ডাক আসাটা মেঘশূন্য আকাশ থেকে একটা বাজ পড়ার মতই।

ঘরে ঢুকে দেখেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সামনে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দত্ত সাহেব বসে। কোম্পানীর বাৎসরিক আয়-ব্যয় লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ তিনিই করে থাকেন। ওই হিসেবপত্রের সুতো ধরেই তাঁর সঙ্গে আনন্দকিশোরের অনেক দিনের যোগাযোগ। ভদ্রলোক স্নেহ করতেন তাকে। দুজনের কারো মুখই বিপজ্জনক রকমের গম্ভীর নয় দেখে মনে মনে স্বস্তিবোধ করেছিলেন একটু।

–বোসো। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সহজ আপ্যায়নে হকচকিয়ে গেছলেন তিনি। আদেশ পালন করার মত করে দত্ত সাহেবের পাশের চেয়ারে

www.bengaliebook.com

বসেছিলেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি, আর আনন্দকিশোরের ছেচল্লিশ –কিন্তু এই তুমি বলার মধ্যে খুব প্রচ্ছন্ন একটু অন্তরঙ্গ স্পর্শও পেলেন যেন।

–তোমার ছেলে স্কুল ফাইনালে সেকেণ্ড হয়েছিল?

প্রশ্নটা এত অপ্রত্যাশিত যে প্রায় দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল।

–আজ্ঞে হ্যাঁ..

–আই, এসসি-তে ফার্স্ট হয়েছিল?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–এবারে বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–কোন সাবজেক্ট?

–আজ্ঞে অঙ্ক।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী কৃতী ছেলের বাপের মুখখানা পর্যবেক্ষণ করলেন একটু।–তুমি কত মাইনে পাও এখন?

–আজ্ঞে তিনশ সত্তর।

–ছেলেকে বাড়িতে পড়াতো কে, তুমি না মাস্টার?

–আজ্ঞে ও নিজেই পড়ত।

–এখন এম, এ পড়বে?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–ছেলেটিকে একবার নিয়ে এসো তো, দেখব। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড টু হিয়ার

বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আনন্দে ঘেমে ওঠার দাখিল। প্রতিবারের। সুখবরের মত ছেলের সুখবরটা সেই সকালেই দত্ত সাহেবকে জানিয়েছিলেন তিনি।

যতটা সম্ভব ভব্যসভ্য করে ছেলেকে পরদিনই বড় সাহেবের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার সেই চাপা উত্তেজনা আর ব্যস্ততা দেখে গৌরকিশোর হকচকিয়ে গেছলেন। ঘাবড়ে গিয়ে প্রণাম করার তাড়ায় চেয়ারের আড়ালে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দ্বিতীয় পা খুঁজে না পেয়ে এক পায়ের জুতোর উপরে দুবার হাত বুলিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছেন। কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী ঈষৎ কৌতুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাকে।

কিন্তু তার মন্তব্য শুনে বাপের মুখে কাষ্ঠ হাসি আর ছেলের মুখে বিড়ম্বনার ধকল। বড় সাহেব হেসে বলেছেন, লেখাপড়ায় তুমি এত ভালো…বাট ইউ ডোন্ট লুক দ্যাট স্মার্ট।

বাবা বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, হাবাগোবার মত চুপ করে থাকিস না, একটু আধটু কথা বলবি। অতএব চুপ করে না থেকে গৌরকিশোর কথাই বলেছেন। –চেষ্টা করিনি স্যার…

কৌতুকে নড়েচড়ে বসেছেন কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী।–কি চেষ্টা করোনি, স্মার্ট হতে?

এবারে আর জবাব জোগালো না, মাথাই নাড়লেন শুধু অর্থাৎ তাই।

–কি চেষ্টা করেছ?

গৌরকিশোর ফাঁপরে পড়েছিলেন, জবাব দিয়েছেন, একবার সেকেণ্ড হবার পর। থেকে ফার্স্ট হতে চেষ্টা করেছি।

আর একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বড় সাহেবের ঠোঁটের ডগার হাসি আরো স্পষ্ট হয়েছিল।–চেষ্টা করলে স্মার্ট হতেও পারো বলছ?

নিরুপায় গোছের মাথা নেড়েছিলেন গৌরকিশোর– পারেন।

হাসি মুখে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উপদেশ দিয়েছেন, আচ্ছা এম, এ-তে ফাস্ট হবার পর সে চেষ্টা কোরো। ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ

ছেলেটাকে একেবারে হাবাই ভাবলেন কিনা বড় সাহেব, বাবা দিনকতক সেই অস্বস্তি ভোগ করেছেন। তারপর একদিন দোকান থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ঢুকেছেন। কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউনটেন্ট বলে কোনো পোস্ট ছিল না এতদিন–এখন হল। জনাকতক জুনিয়র আর সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট কোম্পানীর কাজ চালাতেন। চ্যাটার্জী মেটালস-এর তিনিই প্রথম চীফ অ্যাকাউনটেন্ট-মাইনে তিনশ সত্তর থেকে এক লাফে পাঁচশ সত্তর।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে গৌরকিশোরের আবার দেখা হয়েছে মাস নয়েক বাদে। শোকের আর দুশ্চিন্তার তাপ নিয়ে গেছলেন বাবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে, আর কিছু না হোক, দুটো সহানুভূতির কথা শুনবেন আশা ছিল। কিন্তু শোকের তাপের সঙ্গে অবজ্ঞার তাপ নিয়ে ফিরেছেন।

বেয়ারার মুখে খবর পেয়ে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী তাকে ঘরে ডেকেছিলেন অবশ্য। বসতে বলেননি। তার পরনে কাঁচা-কোঁচা, হাতে আসন, একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মুখ তুলে একবার শুধু দেখেছিলেন তাঁকে, তারপর আবার ফাইলে মন দিয়েছিলেন। বাবার আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। সন্তর্পণে শ্রাদ্ধ-পত্র তার সামনে টেবিলে রাখতে মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে শুধু বলেছেন, ঠিক আছে

বাইরে এসে গৌরকিশোরের কান্না পাচ্ছিল পাঁচটি ভাই বোন তারা, তিনিই বড়। বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে শোকের থেকেও তিনি চোখে অন্ধকার দেখেছেন বেশি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘর থেকে বেরুতে সেই অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল।

www.bengaliebook.com

অবাক একটু হয়েছিলেন ঠিক দুদিন বাদে। নতুন চিফ অ্যাকাউনটেন্ট নিজে এসেছিলেন বাবার সমস্ত পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে মিটিয়ে দিতে। তাছাড়া বাড়তি এক হাজার টাকা দিয়েছেন বড় সাহেবের নাম করে–বাবার শ্রাদ্ধের কাজের বাবদ। হাতে টাকা নিয়েও গৌরকিশোর ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না।

আর হতচকিত হয়েছেন বাবার কাজের দিনে। ভাঙা বাড়ির দরজায় মস্ত ঝকঝকে গাড়িটা থামতেও ঠাওর করে উঠতে পারেননি কে এলেন। বিমূঢ় মুখে ছুটে এসে তারপর গাড়ির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন গৌরকিশোর।

শ্রাদ্ধবাসরে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী মিনিট পাঁচেক বসেছিলেন। যাবার আগে বলে গেছেন, কাজকর্ম চুকে গেলে অফিসে একবার দেখা কোরো।

দেখা করেছেন। এই দিন বড় সাহেব তাকে বসতে বলেছেন। আলাপ করেছেন। বাড়িতে কে আছে না আছে খোঁজ নিয়েছেন। চিন্তা করেছেন একটু। তারপর বলেছেন, মন দিয়ে পড়াশুনা করে যাও–তোমার বাবা খুব বিশ্বস্ত কাজের লোক ছিলেন, তুমি এম, এ পাশ না করা পর্যন্ত কোম্পানী তাই তোমার মায়ের নামে মাসে দুশ টাকা করে দেবে ঠিক করেছে।

গৌরকিশোরের চোখে জল আসার উপক্রম। অল্প হেসে বড় সাহেব বলেছেন, আর একটা কথা, এখন থেকেই একটু স্মার্ট হতে চেষ্টা করো–এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে না। আচ্ছা এসো, উইশ ইউ ভেরি ভেরি গুড লাক!

গোরকিশোর আবার দেখা করতে এসেছেন এক বছর পাঁচ মাস বাদে। এম,– এ পরীক্ষার ফল বেরুবার পর।

তাকে দেখামাত্র উৎফুল্ল মুখে বড় সাহেব হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এবারের সুখবরটা সেদিনের সকালের কাগজে দেখেছেন তিনি। বারকয়েক খুশি জ্ঞাপন করে টেবিলের ব্রোতাম টিপে বেয়ারার তলব

www.bengaliebook.com

করেছেন। দুই ছেলে, অর্থাৎ বড় আর মেজ চ্যাটার্জী সাবকে একসঙ্গে সেলাম দিতে বলেছেন।

ছেলেরা আসতে হাসিমুখে গৌরকিশোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। –আনন্দকিশোরের ছেলে গৌরকিশোর, স্কুল-ফাইনালে শুধু পরীক্ষা খারাপ করে সেকেণ্ড হয়ে বসেছিল–তারপর আই, এসসি-তে ফার্স্ট, বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, আর এবার এম, এ-তে ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট।

পরিচয়-পর্বে শুধু বড় সাহেব নয়, গৌরকিশোরের সৌজন্যসূচক স্মার্টনেসের অভাব ছেলেরাও লক্ষ্য করলেন। কোম্পানীতে বিলেত-ফেরত এনজিনিয়ার আছেন চারজন, সেখানে এম, এ-র এই কৃতিত্ব বাবার কাছে এমন বড় ব্যাপার হল কি করে ছেলেরা বুঝলেন না!

বড় সাহেব বললেন, তোমরা দুজনেই ওকে ভালো করে কাজ-কর্ম শেখাবে। ...ওর ডেসিগনেশন কি হবে? বড় ছেলের দিকে ফিরলেন, এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দাও, পরে দেখা যাবে।

সেক্রেটারী বড় ছেলে।

হাসিমুখে বড় সাহেব গৌরকিশোরের দিকে ফিরলেন, এঁদের সঙ্গে যাও, খুব বুঝে-শুনে ভালো করে কাজ-কর্ম করবে।

একটানা তিন বছর চ্যাটার্জী মেটাল-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হয়েই ছিলেন গৌরকিশোর। কাজে সুনাম কিছু হয়েছে, কিন্তু সেটা চটকদার সুনাম নয়। দায়িত্বের কাজ দিলে সেটা তার দ্বারা সুসম্পন্ন হবে কিনা বোঝা ভার, অথচ শেষ পর্যন্ত হয় ঠিকই। ফলে কাজ যাঁরা দেন তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না সর্বদা। বড় সাহেব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন, কেমন?

তারা বলেন, ভালই, তবে আনস্মার্ট।

কৃষ্টকমল চ্যাটার্জী মাথা নাড়েন, আনস্মার্ট ঠিক নয়...ডিফরেন্ট টাইপ।

তাঁর মতলব বোঝা গেছে তিন বছর বাদে-বছর দুয়েকের চেষ্টায় ছোট মেয়ে লোটি অন্যথায় লতা চ্যাটার্জী যখন টেনেটুনে বি, এ পাশ করে উঠলেন।

কমল চ্যাটার্জীর তিন ছেলে, ছোট ছেলে গৌরকিশোরের থেকে বছর দুয়েকের ছোট, আর লতার থেকে বছর তিনেকের বড়। ছোট ছেলে সক্রিয়ভাবে চ্যাটার্জী মেটাল-এ ঢোকেননি তখনো। ওদিকে বড় দুই ছেলের পরে দুটি মেয়ে ছিল, হর ছোট ছেলের পর লোটি–সর্বকনিষ্ঠা। বাপের বেশি বয়সের মেয়ে, তাই তার আদরও বেশি। বেশি আদরের আরো একটু কারণ আছে।

কৃকমল চ্যাটার্জীর এখন সর্বসাকুল্যে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে এ হত্যা করেছেন।

বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী। বড় মেয়ের বিয়ে নিলেন মস্ত বনেদী ঘর দেখে। মানুষ দেখেননি তেমন করে। বড় মেয়ের আত্মহত্যর পর একটানা বছরখানেক কেস চালিয়েছিলেন তিনি মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী আর জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ফল হয়নি।

মেজ মেয়েরও ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন এক মস্ত ব্যবসায়ীর ঘরে। বিশেষ অবস্থাপন্ন তারাও। তাদের আবার চালচলন জাঁকজমক এত বেশি যে তাই থেকেই বিরোধের সূত্রপাত। তার ওপর মেজ জামাইয়ের নাক তাদের পরিবারের মধ্যে সব থেকে বেশ উঁচু। তুচ্ছ রেষারিষি বড় বিরোধে দাঁড়িয়েছে–মেজ জামাইটি নিজেও দূরে সরেছেন, মেয়েকেও দূরে সরিয়েছেন।

বড় ঘরে মেয়ে দেবার সাধ মিটেছে ভদ্রলোকের। ছোট মেয়ের বয়স তখন। সোলও নয়, কিন্তু তখনই সঙ্কল্প করেছেন আর বড় ঘর নয়। মেয়েকে কারো হাতে দেবেন না, বরং মেয়ের হাতের মুঠোয় কাউকে এনে দেবেন।

তাই দিয়েছেন।

.

বিয়েটা যখন হয়েই গেল, অর্থাৎ কল্পনার আকাশকুসুম যখন সত্যিই বাস্তব জীবনে খসে পড়ল, গৌরকিশোরের বয়স তখন ছাব্বিশ-লতার একুশ। কিন্তু বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই তাদের বয়সটা বিপরীত খাতে বইতে লাগল। গৌরকিশোর বুঝি সবে না-বালকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়েছেন, আর লতার পাকাঁপোক্ত সাবালিকার ভূমিকা।

ছোট মেয়ে, বাপের আদরের মেয়ে বাবাকে পছন্দ করতেন, আর বাবার মুখে শুনেছিলেন চমৎকার ছেলে গৌরকিশোর–তাই চমৎকার যে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিয়ের আগে তাকে দেখে ততটা চমৎকার লাগল না। বাবার কৃষ্ণকমল নাম ভারী ভালো লাগে তার, গৌরকিশোর নামও সেই গোছের ভালো লেগেছিল। বেশ ধারালো অথচ একখানা মিষ্টি মুখ তিনি কল্পনা করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই হোঁচট খেল। তারপর দিনে দিনে হোঁচট খেতে লাগল। ধারের চিহ্নও নেই কোথাও, আর। মিষ্টি অর্থে যদি আনুগত্য হয়, তাহলে মিষ্টিই বটে।

ভিতরে বাইরে এমন এক বর্ণশূন্য লোকের সঙ্গে বাপ তার বিয়ে দিলেন কি করে তিনি ভেবে পাননি। চেনা-জানা যে কটি লোক বিয়ের আশায় ঝুঁকেছিল বা ঝুঁকতে চেয়েছিল, তাদের যে-কেউ এর থেকে অনেক ভালো ছিল। লতার কেবলই মনে হত, অনুগত জামাই আনার তাড়নায় বাবা সব থেকে বেশি অবিচার করেছেন তারই ওপর।

বিয়ের মাসতিনেকের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে বারকয়েক আনুষ্ঠানিক যাতায়াত করেছেন তিনি। জামাইকে ডেকে বাবা নিজেই তারপরে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিধবা মা বা ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতির অভাব নেই, কিন্তু মেয়ে সেখানে থাকতে পারবে না। তার বড় বাড়ির পাশে ছোট বাড়িটা মেয়ের কথা ভেবেই তিন বছর ধরে খালি রেখেছেন তিনি–মেয়েকে নিয়ে আপাতত সেখানেই থাকতে হবে। মেয়ের নামে অভিজাত এলাকায় বেশ খানিকটা জমি কেনা আছে –ধীরেসুস্থে সেখানে বাড়ি করা হলে তারপর অন্য ব্যবস্থা।

www.bengaliebook.com

শ্বশুরের ব্যবস্থা জামাইয়ের মনঃপূত কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। গৌরকিশোরের পৈতৃক বাড়ির সচ্ছলতায় সত্যিই টান ধরেনি, কিন্তু বিনিময়ে বড় কাছের একজনকে খোয়াতে হয়েছে তাদের। মাঝেসাঝে মাকে দেখতে আসেন গৌরকিশোর। এই আসাটাও কমে আসছে। এ নিয়ে বাড়ির কারো অভিযোগ নেই। থাকলেও মুখে অন্তত কেউ কিছু বলে না। কিন্তু দেখা হলে একজন বলেন।

সুমিতা।

গৌরকিশোরের এক মামীর বোনের মেয়ে। সুরসিকা আর ঠোঁট-কাটা। কাছাকাছি বাড়ি, তাই আত্মীয়তার থেকে ঘনিষ্ঠতা বেশি। এম, এ, পড়ার সময়ে মনের তলায়। সুমিতাকে ঘিরে কিছু মিষ্টি সম্ভাবনাও উঁকিঝুঁকি দিত। খুব সংগোপনে। বছর আড়াই মোটা মাইনেয় চ্যাটার্জী মেটাল-এ চাকরি করার পর সেই সম্ভাবনা নিজের মধ্যেই দানা পাকিয়ে উঠেছিল। সুমিতার এম, এ, পরীক্ষার পরই একটা প্রস্তাব উত্থাপনের বাসনা ছিল গৌরকিশোরের। তার আগেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অবশ্য সে জন্য চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। সেই সাময়িক দুর্বলতার খবর সুমিতার জানার কথা নয়। খেদও নেই। বিত্ত বা বৈভব ছেড়ে বড় ঘরের মেয়ের রূপের টানও অন্য রকম।

দেখা-টেখা হলে এই সুমিতাই ঠাট্টার ছলে ঠাসঠাস কথা শুনিয়ে দেন। স্কুল মাস্টারি করে মুখ আরো ঢিলে হয়েছে। এক মুখ হেসে সেদিন মায়ের সামনেই বলেছিলেন, বাবারে বাবা, গৌরদা তুমি দেখালে বটে, রাধিকার জন্যে স্বয়ং ব্রজকিশোরও এভাবে স্বজন ছেড়েছিল বলে শুনিনি!

মা বলেছিলেন, তুই থাম তো

আরো বেশি হেসে সুমিতা প্রতিবাদ করেছিলেন, আমি থামতে যাব কেন? আপনাদের ঘরের ছেলে, আপনারা মুখ বুজে থাকুন।

বিয়ের পর শ্বশুর স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যায়ারিং-এর নতুন শাখা খুলেছেন! তার সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছেন ছোট ছেলে আর জামাইকে। আর পুরনো অফিস থেকে কিছু সুযোগ্য কর্মচারীও দিয়েছেন।

কিন্তু লতার তবু দুশ্চিন্তা হয়েছিল। ছোড়দা আছেন সঙ্গে তাতে যেটুকু স্বস্তি। নইলে ওই মানুষের আলাদাভাবে ব্যবসা দাঁড় করানোর ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাস তার আদৌ নেই।...আগাগোড়া পরীক্ষায় প্রথম হল কি করে, তার ওপর অঙ্কে, সেটাই তার কাছে বিস্ময়। সার্টিফিকেটগুলো না দেখলে বিশ্বাস হত না।

পাঁচ বছরে শাখা-প্রতিষ্ঠান ভালোই দাঁড়িয়েছে। লতার বদ্ধ ধারণা, বাবা চোখ রেখেছিলেন, ছোড়দা আছেন, দরকারমত বড়দা-মেজদাও পরামর্শ দেন, তার ওপর বিশ্বস্ত কর্মচারীরা আছে–তাই দাঁড়িয়েছে। আর কারো কোনো কৃতিত্বের ছিটেফোঁটাও

বিয়ের সাত বছরের মধ্যে নতুন কোম্পানীর লাভের টাকা দিয়ে লতার জমিতে মস্ত বাড়ি উঠেছে। গৃহপ্রবেশে ঘটা করে উৎসব করা হয়েছে।

তারপর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী চোখ বুজেছেন। স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যায়ারিং-এর শিকড় তখন। পরিপুষ্ট। উইল-এ দেখা গেল, এই কোম্পানীর মালিকানার সবটাই তিনি ছোট মেয়ে জামাইকে দিয়ে রেখেছেন। অন্যান্য বিষয়-আশয় এবং চ্যাটার্জী মেটালস তিন ভাইয়ের।

অতএব ছোট ছেলে ভগ্নিপুতির ব্যবসায়ের সংস্রব ছেড়ে চ্যাটার্জী মেটালস-এ চলে এসেছেন। লতা বিমর্ষ এবং চিন্তিত হয়েছিলেন। দাদাদের বলেছিলেন, তোমরা চলে এলে ওর দ্বারা ব্যবসা চলবে?

দাদারা আশ্বাস দিয়েছেন–তারা চোখ ঠিকই রাখবেন, তাছাড়া বিশ্বস্ত কর্মচারীরা তো থাকলেনই।

.

লতার ছাব্বিশ, গৌরকিশোরের একত্রিশ।

যার বীজ ভালো তার ফসলও ভালই। দুর্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানী যে রীতিমত জাঁকিয়ে উঠেছে, তার পিছনে এটাই কারণ ভাবেন মিসেস অধিকারী। গৌরকিশোরই এ ব্যবসার হর্তা-কর্তা বিধাতা বটে, কিন্তু ভাগ্য চারদিক থেকে নিরাপদ প্রহরায় একজন অতি সাধারণ মানুষকে ওইখানে এনে তুলেছে, এই ধারণা তার একটুও বদলায়নি।

ছেলেপুলে এখনো হয়নি। তার কারণ মিসেস অধিকারী এখনো তা চাননি। একতিরিশেও একুশের থেকে বেশি মন দিয়ে সাজ-সজ্জা করেন। সেটা বরং দিন কে-দিন সূক্ষ্মতর হচ্ছে। গায়ের জামা আর শাড়ির মাঝে আড়াই আঙ্গুলের জায়গায়। এখন চার আঙ্গুল কোমর দেখা যায়। কঁধখোলা মিহি ব্লাউসের টেপ ক্রমে গলার দিকে ঘেঁষছে। পোশাক-আশাকের ম্যাচিংএ অভিনবত্ব আসছে। বক্ষদেশের সম্ভারে বিভ্রম ছড়ানোর ললিত প্রয়াস স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। প্রসাধনের পারিপাট্য বেড়েছে। অভিজাত এলাকায় হাই সোসাইটির চটকদার পুরুষ-রমণীর আনাগোনা বেড়েছে।

গৌরকিশোরের অবকাশ কম। প্রচুর খাটেন। আরো খাটলেও আপত্তি নেই লতা অধিকারীর। তাঁর এ-দিকটা নিজস্ব দিক, সংস্কৃতির দিক, মনের পুষ্টির দিক। অতএব গৌরকিশোর মুখ বুজে কাজ করেন আর লতা বা লোটি অধিকারী ঘণ্টা দেড়েক কেশ বিন্যাস করে ক্লাবে যান, ফাংশানে যান, পার্টিতে যান। কিন্তু হাই সোসাইটির রীতি অনুযায়ী যুগল উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয় অনেক সময়। স্ত্রীর কাছে তখনই শুধু তাড়া খেতে হয় গৌরকিশোরের। বলেন, তোমাকে নিয়ে বেরুতে হলেই আমার ভাবনা হয়, ঠিক-ঠাক হয়ে নাও। নিজের ঠিক-ঠাক হওয়ার দিকে এই একজনের অবাধ্য দৃষ্টি বার কয়েক ঘুরতে দেখলেও ধমকে ওঠেন, হ্যাংলার মত চেয়ে থেকো না, আর পার্টিতে গিয়ে আমার পিছনে ঘুরো না–নাও চলো।

অথচ অনুষ্ঠানের কোনো সুপুরুষ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,-ইউ লুক এক্সকুইজিট ম্যাডাম–তার হাতে হাত রেখে স্ত্রীটিকে বিগলিত হতে দেখেন গৌরকিশোর। বলতে শোনেন, থ্যাঙ্ক ইউ

বোকা-বোকা মুখ করে আরো কিছু লক্ষ্য করেন গৌরকিশোর। কারো সঙ্গে শুধু অন্তরঙ্গতা, কারো সঙ্গে বা বেশি। এরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলিতে স্ত্রীর সেই বেশি অন্তরঙ্গতার রূপটাও গৌরকিশোরের নির্বাক চোখে বসে গেছে। একা বেরুলে স্ত্রীর অনেকদিনই ফিরতে রাত হয়–এতেও প্রায় অভ্যস্তই হয়ে উঠেছেন তিনি। ...

মিসেস লোটি অধিকারীর স্বাভাবিক দিনযাপনের সামান্য একটু অস্বস্তির ছায়া। পড়ল সেদিন হঠাৎ।

নিজের চেকবই দুটো যে কোথায় রেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। গৌরকিশোর দাড়ি কামাচ্ছিলেন। স্ত্রী কিছু দরকারী জিনিস পাচ্ছেন না মনে হতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খুঁজছ?

–চেকবই দুটোর একটাও পাচ্ছি না, এক্ষুনি দরকার।

গৌরকিশোর বললেন, সেদিন তোমার টেবিলের ওপর পড়েছিল দেখে কোথায় রাখলাম...ওই আলমারিতে দেখো তো!

দেখলেন নেই।

–তাহলে ও-ঘরে আমার সুটকেসে রেখেছি বোধ হয়...দেখছি।

অপেক্ষা করার সময় নেই মিসেস অধিকারীর। বিরক্ত।–তোমার সবেতে গোলমেলে কাণ্ড, টেবিলের ওপরে ছিল–ড্রয়ারে রেখে দিলেই তো হত!

ও-ঘরে গিয়ে নিজেই সুটকেস খুললেন। চেকবই পেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে দুটো জিনিস চোখে পড়ল, তাতেই অবাক তিনি। একটা ফোটো আর নামকরা দোকান থেকে কেনা একটা শৌখিন শাড়ির প্যাকেট।

ফটো একটি মেয়ের। হাসিমুখ, চেহারাও মন্দ নয়। বেশ স্মার্ট। আর প্যাকেটে কম করে তিনশ সাড়ে তিনশ টাকা দামের শাড়ি একটা।

www.bengaliebook.com

লতা অধিকারী প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন একটু। এ দুটো বস্তু এখানে কেন বোধগম্য হল না। চেকবই পাওয়ার তাড়া ভুলেছেন আপাতত। ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সুটকেসে এক মেয়ের ফটো দেখলাম, কার?

সাবান মাখানো মুখখানায় একটু ব্যস্ততাও লক্ষ্য করলেন যেন।

গৌরকিশোর জবাব দিলেন, আ…আমার ভাইয়ের জন্য, মানে সত্যর জন্য এক জায়গায় মেয়ে দেখতে গেছলাম…ভদ্রলোক ধরেছিলেন, তারাই দিয়ে দিলেন।

স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে-ভাবে বললেন স্ত্রীর সেটাই বিরক্তির কারণ। দশ বছরেও যদি কথাবার্তা সপ্রতিভ হত একটু!–আর, শাড়ির প্যাকেট দেখলাম, সেটা কার?

-ইয়ে, এক বন্ধুর বিয়ে, দেব বলে কিনেছি।

এই জবাবটা কেন যেন খুব সরল ঠেকল না কানে। দোকানে গিয়ে নিজে পছন্দ করে এরকম শাড়ি কিনে নিয়ে আসতে পারে ধারণা ছিল না।–দামী শাড়ি মনে হচ্ছে, কে বন্ধু? কবে বিয়ে?

নাম করে দিলেন একজনের। বললেন, খুব পুরনো বন্ধু। আজই বিয়ে–মানে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।

-তোমার একার নেমন্তন্ন?

–হ্যাঁ, তুমি যেতে পারবে না বলে দিয়েছিলাম।

–পারি বা না পারি তোমার বলার কি দরকার ছিল? আর শাড়ি কিনেছ, আমাকে দেখাওনি কেন?

বিপদগ্রস্তের মত শেভিংএ মন দিলেন গৌরকিশোর।

ব্যাপার কিছুই নয়, তবু ভিতরটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল লতা অধিকারীর। তাকে না জানিয়ে বন্ধুর ভাবী বউয়ের জন্য আড়াইশ তিনশ টাকা দিয়ে শাড়ি কেনা হয়েছে, হলে হতেও পারে!

গৌরকিশোর তার অলক্ষ্যে শাড়ি আর ফটো বার করে নিয়ে অফিসে চলে গেলেন।

বেলা চারটে নাগাদ অফিস থেকে বেরুলেন। আজও মা আর বোন তাকে দেখে খুশি। ভাইয়েরা বাড়ি নেই। কিছুদিন ধরে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে সকলেরই। বিশেষ করে মায়ের। ছেলে প্রায়ই আসছে, তাদের সকলকে নিয়ে সেদিন গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেড়িয়ে এনেছে–সুমিতা এসেছিল, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। আনন্দে মায়ের চোখে জল এসেছিল। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যে কেটেছে–ছেলে সকলের একসঙ্গে আর আলদা আলাদা সক্কলের ফটো তুলেছে।

সেদিনও গৌরকিশোর হাসি-খুশি। শাড়ির প্যাকেট বোনের হাতে দিলেন, নে, এটা তুই পরিস।

শাড়ি দেখে বোনের, আর সেই সঙ্গে মায়েরও চোখ ঠিকরোবার উপক্রম। এ রকম দামী বেনারসী পরা দূরে থাক, বোন হাতে নিয়েও দেখেনি।–এ তুমি আমার জন্যে কিনে আনলে নাকি দাদা!

নির্লিপ্ত মুখে গৌরকিশোর বললেন, কিনে না তো কি আমি বেনারসী বানাচ্ছি!

মা বলেছেন, যত্ন করে তুলে রেখে দে, পরে কাজে লাগবে।

বোন মুখ লাল করে উঠে গেছে। পরে গৌরকিশোর তার মুখেই শুনেছেন, সুমিতাদি আগামী পরশু দিল্লী চলল, সেখানে কি একটা ভালো চাকরি পেয়েছে।

গৌরকিশোরকে অন্যমনস্ক দেখা গেল একটু। ঠিক এরকম খবর আশা করেননি। খানিক বাদে আবার গাড়িতে উঠলেন। তখনো চিন্তামগ্ন।

গাড়ি সুমিতাদের বাড়ির দরজায় থামল। সুমিতা তাকে দেখে অবাক প্রথম, পরে খুশি। আদরযত্ন করে বসালেন, পরে ঠাট্টাও করলেন, এই বাড়িতে ওই গাড়িসুদ্ধ তার মালিক হাজির–কি ব্যাপার?

গৌরকিশোর বললেন, দিল্লীবাসিনী হচ্ছ শুনলাম, তাই এলাম দেখা করতে

। সুমিতা হাসলেন, আমার দিল্লী যাত্রার ভাগ্য বটে!

–কবে যাচ্ছ?

-এই তো পরশু, প্রথমে পাটনায় দিদির কাছে যাব, সেখানে দুদিন থেকে দিল্লী।

–পাটনার গাড়ি কটায়?

–বিকেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে শুনলাম, কেন, সী অফ করতে যাবে?

গৌরকিশোর হাসলেন। কিন্তু তিনি দ্রুততালে চিন্তাও করেছেন কিছু। বললেন, যেতে পারি, বলো তো স্টেশনে পৌঁছেও দিতে পারি।

কি ভাগ্যি! বিশ্বাস করতে বলছ? দিলে তো বেঁচে যাই, আমার সঙ্গে আবার একগাদা মালপত্র।

–ঠিক আছে, আমার গাড়িও ছোট নয়। সাড়ে তিনটেয় গাড়ি তোমার দরজায় হাজির হবে, সোয়া চারটের মধ্যে তুমি আমার অফিসে পৌঁছচ্ছ– পনের মিনিটের মধ্যে তুমি আমার অফিস দেখবে আর এক পেয়ালা চা খাবে–ঠিক সাড়ে চারটেয় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

–আবার তোমার অফিসে নামব।

–নিজের হাতে, গড়লাম, একদিন দেখবেও না?

অতএব সুমিতা সানন্দে রাজি হয়েছেন।

এখানেও এক দফা চা খেয়ে গৌরকিশোর ওঠার আগে ব্যাগ খুলে ফটো বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।–নাও, তোমার ফটো যখন, এক কপি তোমারও প্রাপ্য।

ফটো পেয়ে সুমিতা আরো খুশি। জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক তো তোলা হয়েছিল সেদিন, আর সকলের কই?

-ডেভেলপ করা হয়নি এখনো, পরে পাঠাবখন।

গাড়িতে বসে আবার চিন্তাচ্ছন্ন গৌরকিশোর। বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী বাড়িতে নেই। ভাবনার অনুকূল অবকাশ পেলেন। কিন্তু যা ভাবছেন, তার সুরাহা ঠিক হল না যেন।

পরদিন অফিসেও চিন্তামগ্ন। আগামী কাল ঠিক পাঁচটায় স্ত্রীর সঙ্গে একটা জরুরী সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন সৃষ্টি করা দরকার। ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে দুজনের কোথাও এক পার্টির নেমন্তন্ন থাকলেও বেঁচে যেতেন।

নেই। ফাইল সব টেবিলে পড়ে থাকল, গভীর ভাবনায় গৌরকিশোর তন্ময়।

হঠাৎ সচকিত তিনি। মনে পড়েছে কিছু। ভিতরে চাপা উত্তেজনা। ঠাণ্ডা হয়ে বড় শালাকে টেলিফোন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সকলে মিলে কেনার জন্য সেদিন একটা জমি দেখার কথা বলছিলেন, সেটা কোথায়?

ওধার থেকে জবাব এলো, তোমার বাড়ি থেকে গাড়িতে মিনিট পনেরর পথ।

–ঠিক আছে, কাল চলুন তাহলে–এর মধ্যে কালই তবু বিকেলের দিকে একটু ফ্রী আছি।

পরদিন বিকেলেই জমি দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হল। বিকেল পাঁচটা থেকে পাঁচটা দশ মিনিটের মধ্যে দুই শালা তার বাড়িতে আসবেন। গৌরকিশোরও অফিস থেকে তার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছুবেন। তারপর তাকে নিয়ে সকলে মিলে জমি দেখতে যাবেন।

www.bengaliebook.com

পরদিন দাদাদের সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম লতা রাত্রিতে শুনলেন। দাদারা যাতে আছেন তাতে তারও আগ্রহ স্বতঃস্ফুর্ত। অতএব তিনি সানন্দে রাজি।

পরদিন অফিস যাবার আগে তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন, পাঁচটার একটু আগেই চলে এসো, দেরি কোরো না-তোমার তো আবার যা সময়ের জ্ঞান

অফিসে এসে সেদিন আর ফাইল স্পর্শও করলেন না গৌরকিশোর।

সময়মত সুমিতার বাড়িতে, গাড়ি গেল, আর সময় ধরেই সুমিতা এলেন।

সকলে ধরে নিলেন তেমন বিশিষ্ট মহিলাই কেউ এসেছেন, নইলে বড় সাহেব নিজে বেরিয়ে এসে আদর করে তাকে নিয়ে যেতেন না।

ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে চারটেতেই সুমিতাকে নিয়ে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরুলেন গৌরকিশোর। দুপা এগিয়েই কি বুঝি মনে পড়ল তাঁর। বললেন, এক মিনিট

আবার ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোন তুলে মৃদু গলায় অফিসের অপারেটর গার্লকে নির্দেশ দিলেন কিছু। তারপর রিসিভার রেখে বেরিয়ে এলেন।

.

ঠিক পাঁচটা বাজতে লতা অধিকারীর মুখ গম্ভীর। দাদারা মিনিট তিনেক আগে এসে গেছেন, কিন্তু এই লোকের দেখা নেই। পাঁচটা বেজে পাঁচ হতেই ব্রিক্তির তাপ বাড়ল। পাঁচ মিনিট পর্যন্তই তিনি সময়ের হেরফের সহ্য করে থাকেন। গনগনে মুখে দাদাদের কাছ থেকে উঠে এসে শোবার ঘরে ঢুকে টেলিফোন তুলে নিলেন। অফিসের নম্বর ডায়েল করতে অপারেটর মেয়ের সাড়া পেলেন।

–মিঃ অধিকারী প্লীজ!

নির্দেশমতই অপারেটর সবিনয়ে জানালো, তিনি তো নেই, মিসেস অধিকারী এসেছিলেন–একটা জরুরী কাজে তার সঙ্গে তাকে বেরুতে হয়েছে।

স্পষ্ট শুনেও লতা অধিকারী ঠিক বুঝলেন না। বিস্মিত এবং দ্বিগুণ বিরক্ত। –কে এসেছিলেন?

-মিসেস অধিকারী।

লতা বিমূঢ়।–মিসেস অধিকারী কোথায় এসেছিলেন?

–আজ্ঞে, অফিসে।

–মিঃ অধিকারী তার সঙ্গে বেরিয়েছেন?

–আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কে কল করছেন বলুন, মিঃ অধিকারী কাল এলে জানাব—

–মিসেস অধিকারী।

রিসিভার আছড়ে রাখলেন তিনি। ওদিক থেকে টেলিফোনের মেয়েটা হতভম্ব।

সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ লতা অধিকারীর। মাথার মধ্যে কি যেন ওলট-পালট হতে শুরু করেছে। বুদ্ধিও ঘুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। ঘর থেকে বেরুলেন প্রায় দশ মিনিট বাদে। দাদারা জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, কি হল?

তিনি বললেন, হঠাৎ কি জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছে শুনলাম। আজ আর হবে না দাদা, কতক্ষণ অপেক্ষা করবে।

তারাও বিরক্তি চেপেই উঠে গেলেন।

একলা বাড়িতে লতা অধিকারী জ্বলতে থাকলেন। ঠাণ্ডা মাথায় যত বেশি ভাবতে চেষ্টা করছেন, ততো বেশি জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কানে মাথায়

বারকয়েক জল দিয়েছেন। ভাবতে চেষ্টা করেছেন, হতেও পারে আর কোনো মিসেস অধিকারী।...হয়ই যদি আর কেউ, সে এমন কে যার জন্যে বাড়ির অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাও মনে থাকল না...মনে। থাকলে টেলিফোনে জানিয়ে দিল না কেন?

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পার হল–এখনো দেখা নেই। হিজিবিজি চিন্তায় ভিতরটা তেতেই উঠছে ক্রমশ।...অত দামের শাড়ি কিনে এনে চুপচাপ বাক্সে রাখা হয়েছিল কার জন্যে?...ওই ফটোই বা কার? যে-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেখানকার ভাইয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল...ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কেন এখন? মিসেস অধিকারী এসে মিঃ অধিকারীকে ডেকে নিয়ে গেল...সকলে কোন্ মিসেস অধিকারী ভেবেছে?

.

লতা অধিকারী কেবল বসছেন উঠছেন ঘরে বারান্দায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। ভাবতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু অসহ্য রাগে ভাবতে কিছুই পারছেন না।

গৌরকিশোর ফিরলেন রাত্রি প্রায় সাড়ে নটায়। সুমিতার গাড়ি ছাড়ার পর স্টেশন থেকে বেরিয়ে কি ভেবে দমদম চলে গেছলেন তিনি। এরোড্রামে একটানা দুঘণ্টার ওপর বসে থেকে তারপর উঠে চলে এসেছেন।...ড্রাইভারকে জেরা করবে না হয়ত, সেখানে কালচারের প্রশ্ন। আর করেই যদি, ধরা পড়তে আপত্তি নেই। ধরা পড়বার আশাতেই তো এত কিছু।

অন্য দিন লতা চোখ তুলে তাকান না, আজ শুধু তাকিয়েই রইলেন। স্ত্রীর মেজাজ পত্র সুবিধের নয়, জামাকাপড় বদলাবার ফাঁকে গৌরকিশোর শুধু এটুকুই লক্ষ্য করলেন যেন।

মিনিট পাঁচ সাত দুচোখ দিয়ে ওই মুখ ফালাফালা করে ভিতরে দেখতে চেষ্টা করলেন লতা অধিকারী। লোকটার ওই বিড়ম্বনা অভিব্যক্তি কেন যে মেকী মনে হল জানেন না।–এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

-একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম।

–দাদাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কাজে আটকে পড়লে কেন?

গৌরকিশোরবাবু যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই খেলেন হঠাৎ। কিছু মনে পড়েছে–সমস্ত মুখে সেই চকিতবিমূঢ় অভিব্যক্তি। ঢোক গিললেন, তারপর আমতা আমতা করে বললেন, হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে হল…ইয়ে, ঠিক খেয়াল ছিল না। আবার ঢেক গিললেন।–তু-তুমি অফিসে আমার খোঁজ করেছিলে নাকি?

রমণীর দুই চোখ তার মুখের ওপর আরো যেন কেটে কেটে বসছে। তিনি চোর ধরেননি, গোবেচারা-মুখ একটা ডাকাত ধরেছেন যেন। জবাব দিলেন না, শুধু প্রশ্নই করলেন।-তুমি কোন কাজে আটকে গেছলে?

মিথ্যে বললে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, এই ভয়েই যেন সত্যি জবাব দিলেন। এই…একজনকে তুলে দিতে গেছলাম

কাকে তুলে দিতে গেছলে?

–একটি মে-মানে–মহিলাকে।

–কোথায় তুলে দিতে গেছলে?

দমদম এরোড্রামে।

–তার নাম কি?

ঢোক গেলাটা এবারে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল লতার চোখে।

–রমা।

রমা কি?

–ব্যানার্জী…

দুই চোখে নিঃশব্দে ওই মুখ আর এক প্রস্থ দগ্ধে দিলেন লতা অধিকারী। মিসেস অধিকারী তাহলে কে, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করলেন না। যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছেন, আরো কিছু বোঝা দরকার।

–তিনি কোথায় গেলেন?

–লণ্ডন।

–একা?

-হ্যাঁ, আগেও একবার গেছল, অক্সফোর্ডের এম, এ। সেখানকার ইকনমিক রিসার্চ অর্গানিজেশনে বড় চাকরি নিয়ে গেল, এখানেও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার ছিল।

-তুমি তাকে চিনলে কি করে?

–বি, এ-তে অঙ্ক ছিল, আমার কাছ থেকে অঙ্ক বুঝে নিত।

লতা অধিকারী দেখছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন।-প্লেন কটায় ছেড়েছে?

রাত সাড়ে আটটায়।

–তুমি সাড়ে চারটেয় বেরিয়েছিলে কেন?

–কিছু, মানে–কেনাকাটা ছিল

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই। শেষবারের মত ওই মুখ ঝলসে দিয়ে লতা অধিকারী বেরিয়ে এলেন। তারপর রাতের মধ্যে আর ওই ঘরমুখো হলেন না। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় সমস্ত রাত ধরে জ্বললেন আর ছটফট করলেন। ওই শাড়ি কার জন্যে কেনা হয়েছিল, আর ওই ফটোই বা কার-খুব ভালো করেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। জীবনে এরকম স্তম্ভিত আর তিনি হননি। গোবেচারার মুখোশপরা এত শয়তানী তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। পাছে অফিসের কেউ কিছু মনে করে এজন্যে মিসেস অধিকারী বলে

চালানো হয়েছে ওই মেয়েটাকে–এতখানি ধূর্ত! অফিসে প্রায়ই যাতায়াত ছিল নিশ্চয়, একদিন দুদিন হলে লোকের চোখে ধূলো দেওয়ার দরকার হত না। জীবনের মতই শিক্ষা দেবেন তিনি, কিন্তু কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না বলেই একটুও শান্ত হতে পারছেন না।

...একদিন দুদিন বা একবছর দুবছর নয়–ওই লোক একটানা দশ বছর ধরেই চোখে ধূলো দিয়ে এসেছে তার। নিজের বোকামিটাই থেকে থেকে বড় হয়ে উঠছে! সত্যি সত্যি গোবেচারা হলে আই, এস-সি থেকে এম, এ, পর্যন্ত একটানা ফার্স্ট হয় কি করে, এটা তার ভাবা উচিত ছিল। ...সেও আবার অঙ্কে! নির্বোধ হলে তার অত বুদ্ধিমান বাবা তাকে জামাই করতেন না, এ সত্য আজ নতুন করে চিন্তা করতে হল। আর মগজের। সে-রকম জোর না থাকলে দেখতে দেখতে ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠত না, তাও এই রাতেই প্রথম উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ডের এম, এ, পাস মেয়ের অত খাতির পেতে হলে মাথায় যে বেশ কিছু থাকা দরকার, তাও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন তিনি।

মাথার মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে।...এই বাড়ি তার, ওই ব্যবসায়ও তারই। বাবার টাকায়। অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি। কিন্তু সেভাবে হেস্তনেস্ত করার। মত আর আক্রোশ মেটার মত কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না।

দিন কাটতে লাগল। একটা দুটো করে মাসও।

লতা অধিকারীর ক্লাবে যাওয়া কমে এলো, ফাংশনে যাওয়া কমে এলো, পার্টিতে যাওয়া কমে এলো, কমতে কমতে বন্ধই হয়ে এলো একসময়। উষ্ণ আপ্যায়নের অভাবে চটকদার পুরুষ-রমণীদের আনাগোনায় ভাটা পড়ল। প্রসাধনের একাগ্রতায় ছেদ পড়ল, ম্যাচিংএ অভিনবত্ব রচনার ঝোঁক গেল, টেপ ব্লাউস গলা থেকে সরতে সরতে ক্রমে কাধ। ঢেকে দিতে লাগল, গায়ের জামা আর শাড়ির মাঝের ফারাক সঙ্কীর্ণতর হতে থাকল।

সমস্ত অবকাশ শুধু একজনের প্রতি সজাগ লক্ষ্য আর প্রহরায় নিবিষ্ট হল।

.

লতা অধিকারী প্রথম সন্তানের জননী হলেন বত্রিশ বছর বয়সে–ছেলে। দ্বিতীয় সন্তান এলো সাড়ে তেত্রিশে–ছেলে। তৃতীয় সন্তান এলো ছত্রিশে–ছেলে।

লতা অধিকারী অসহিষ্ণু বিরতি ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতে আর একজনের অভিলাষ টের পেয়ে তপ্ত হয়ে উঠলেন–একটি মেয়ের বাসনা। সরোষে। একটানা বছর দুই বাসনা নাকচ করে চললেন।

তারপর চতুর্থবার এবং শেষবার নার্সিংহোমে এলেন উনচল্লিশ বছর বয়সে।

এবারও ছেলে।

পরদিন গৌরকিশোর নার্সিংহোমের ঘরে এসে দাঁড়ালেন মাত্র, তার মুখের ওপর এক পলক আগুন ছড়িয়ে লতা অধিকারী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, হয়েছে? ফের কাছে। ঘেঁষবে তো তোমাকে আমি

কি করবেন সেটা আর সম্পূর্ণ করে উঠতে পারলেন না। সেই চিরাচরিত গোবেচারা-মূর্তি দেখে গা জুলল তার। সরোষে পাশ ফিরলেন।

লতা অধিকারীর আটান্ন আর গৌরকিশোরের তেষট্টি।

এ পর্যন্ত সমান দাপটে স্বামী শাসন করে এসেছেন লতা অধিকারী, ওই মুখের সদা গোবেচারা ভাব আজও তার চক্ষুশূল। শাসন দেখে মনে মনে ছেলেরাও মায়ের থেকে বাপের প্রতি বেশি সদয়।

বাইরে তারা আদর্শ অভিজাত দম্পতি। কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে একজনকে ছেড়ে আর একজনকে দেখেনি কেউ। অল্পবয়সী ছেলেরা বলে কায়াযুক্ত ছায়া যথা

সেদিনও কি এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গেছলেন গৌরকিশোর। লতা অধিকারী যথারীতি তার পাশে প্রধানা মহিলার আসন গ্রহণ করেছেন। সভাপতির চিরাচরিত সংক্ষিপ্ততম ভাষণের ভূমিকা শুনে লতা অধিকারীর

www.bengaliebook.com

গা জ্বলেছে। গৌরকিশোর বলেছেন, বক্তৃতা করার মত অত চালাকচতুর বা চৌকস নন তিনি, অতএব কি আর বলবেন...।

বাড়ি ফিরেই বিব্রত মুখ করে স্ত্রীকে জানালেন, শরীরটা কেমন যেন করছে, ভালো লাগছে না।

বক্তৃতায় টিকা-টিপ্পনী কেটে এসে এখন একটু সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের ছল কিনা, মুখের দিকে চেয়ে সেটাই আগে বুঝতে চেষ্টা করলেন লতা অধিকারী। কিন্তু খটকা লাগল কেমন।

গৌরকিশোর ঠাণ্ডা জল চেয়ে খেলেন এক গেলাস। শুয়ে পড়লেন। শরীরের সমস্ত রক্তকণাগুলো যেন জ্বলছে আর গায়ে আলপিন ফোঁটাচ্ছে। বুকের একদিকে যন্ত্রণাও বোধ করছেন। মাথার উপর পুরোদমে পাখা ঘুরছে কিন্তু তিনি ঘামছেন। চোখে ঝাপসা দেখছেন। স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখলেন। একটু বাদে ফিরে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন তাও টের পেলেন। ছেলেরা ঘরে ঢুকেছে, দুজন আবার ছুটে বেরিয়েও গেল মনে হল। চোখ টান করে স্ত্রীর মুখখানাই দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি। মাথার ভিতরে সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, রক্তের জ্বালা বাড়ছে, আর ফাঁকে ফাঁকে কি যেন মনে করতে চেষ্টা করছেন তিনি। ভবিষ্যৎ গণনায় পটু এক বন্ধুকে কবে যেন কি দেখতে পাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন...

গৌরকিশোর চোখ বুঝলেন। আর তাকালেন না।

লতার চোখে জল দেখতে চেয়েছিলেন গৌরকিশোর।

লতা অধিকারী অঝোরে কাঁদছেন।

গৌরকিশোর দেখছেন কি?

তপ

মহিলাকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, গল্প আছে।

কথাটা সুবল মিশ্রকে বলেছিলাম। সুবল মিশ্রর দেশ উড়িষ্যায়, বিদ্যালাভ পশ্চিম বাংলায় তথা কলকাতায়, কর্মস্থল এই সুদূর ব্রহ্মপুত্রের দেশে। আমার সঙ্গে আলাপ এবং হৃদ্যতা ছাত্রজীবন থেকে। একই হস্টেলে একই ঘরে থাকতুম। এখন সে পয়সাঅলা লোক, চা-চালানের কারবারী। বছরে বার পাঁচেক কলকাতায় আসে। তাই যোগাযোগ আছে। আগে সে নিজে থাকত উড়িষ্যায়, তার কর্মচারী থাকত আসামে। বছর তিনেক হল নানা কারণে সে নিজেই আসামে স্থায়ী প্রবাসী হয়েছে।

সম্প্রতি আমি তার অতিথি।

তার ডেরা থেকে দু মাইল দূরে মাতৃকুটারের মায়ের প্রসঙ্গে আমার ওই উক্তি যে তার কাছে এমন কৌতুকের ব্যাপার হবে জানতাম না। দুদিন বাদে আবার যখন তাকে সঙ্গে করে এলাম মহিলার কাছে, তখন সে একঘর লোকের সামনেই আমাকে নাজেহাল করল। বলল, মা ভালো ডাক্তার, শুনেছি বাতাস টেনে রোগের গন্ধ পায়, আমাদের সাহিত্যিকও তেমনি আপনাকে দেখেই গল্পের গন্ধ পেয়েছে। সেদিন আপনাকে দেখে গিয়ে বলছিল, গল্প আছে।

ঘরে আমার অপরিচিত যে কজন ছিল সুবল মিশ্রর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তার হেসে উঠল। ঘরে মা অর্থাৎ মহিলার কৃতী ছেলে আর ছেলের বউ ছিলেন। ছেলে আমাদেরই বয়সী। আগের দিনের আলাপে তাকে স্বল্পভাষী মনে হয়েছিল। সুবল মিশ্রর কাছে শুনেছি মহানন্দ ঘোষ অর্থাৎ ওই ছেলে কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টারদের। একজন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বছরে দুবার মায়ের কাছে আসেন–পূজোর ছুটিতে আর গরমের ছুটিতে। মায়ের ছেলে-অন্ত প্রাণ, কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে তিনি নড়তে চান না। তাই ছেলেকেই ছুটে আসতে হয়। সুবল মিশ্র শুনেছে. এখানে বছর পনের আগেও ছোট পড়ো বাড়ি ছিল একটা। জায়গাটা এখনই নির্জন, এর থেকে অনেক বেশি ফাঁকা ছিল তখন। দেখতে দেখতে ছেলের পসার হয়েছে, উপার্জনের টাকা দিয়ে প্রথমেই তিনি এই ছিমছাম বাংলা প্যাটার্নের

মাতৃকুটার স্থাপন করেছেন। শোনা যায় সেই পড়ো বাড়িতে কন্যা এক বৃদ্ধ থাকতেন। সে প্রায় তিন যুগ আগের কথা।

শুধু মাতৃকুটীর স্থাপন নয়, সুবল মিশ্রর মুখে শুনেছি মাতৃভক্ত এই ব্যারিস্টার ছেলে মায়ের নির্দেশে এখানকার গরিবদের হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছেন আর ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় গ্রাম থেকে মানুষ বাঁচানোর জন্য কত সময় কত টাকা ঢেলেছেন ঠিক নেই।

শুনে ভালো লেগেছিল। তব প্রথম দিনের আলাপে ভদ্রলোকের বাকসংযম কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়েছিল আমার। ওটুকু পয়সাঅলা নামকরা ব্যারিস্টারের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত ধরে নিয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল, চেহারাখানা ভদ্রলোকের এখনো বহুজনের মধ্যে চোখে পড়ার মতই নিখুঁত সুন্দর, সেই কারণেও হয়ত একটু সচেতন এবং মিতভাষী।

হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত করে সুবল মিশ্র মায়ের প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য ফাঁস করার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই নামী ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা যেন আমার মুখের ওপর থমকাতে দেখলাম কয়েক মুহূর্ত। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রীটির চোখেমুখেও নীরব চাপা বিস্ময় দেখা গেল। আর এই কারণেই আমার আবারও মনে হল, গল্প আছে।

মা হাসছেন মিটি মিটি। ষাটের কাছাকাছি বয়েস এখন। বয়েসকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। হাসিটুকু আরো কমনীয়। তার ওপর বুদ্ধির ছাপ।

ঘরে আর যারা ছিল তার বেশির ভাগই ওষুধপ্রার্থী। কেউ ওষুধ নেবে, কারো বা পুরনো ওষুধ ফুরিয়েছে, এখন কি করবে জিজ্ঞাসা। মা একে একে তাদের বিদায়। করলেন, কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা বললেন, অনেক ওষুধ খেয়েছ আর কাজ নেই। সবল মিশ্র বলে, মা পাকা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। আগে যাদের পয়সা জুটত না তারাই শুধু চিকিৎসার জন্যে মায়ের কাছে এসে জুটত। অনেকের অনেক কঠিন। ব্যামোও মায়ের ওষুধে ভালো হয়েছে নাকি। ওষুধে ভালো হয়েছে কি মায়ের কোন রকম দৈবশক্তি আছে সেই বিশ্বাসে–বলা শক্ত। প্রচারের ভার তারাই নিয়েছে। অনেক দূর থেকেও হামেশাই রোগী আসে এখন। আর শুধু

অভাবী লোকই আসে না, পয়সাঅলা লোকও অনেক আসে। এ-সব ব্যাপারে বিশ্বাস বস্তুটা রোগের মতই। সংক্রামক বলা যেতে পারে।

মা ডাক্তার কেমন জানি না, কিন্তু রীতিমত শিক্ষিত যে তাতে সন্দেহ নেই। এই বসার ঘরেই একটা আলমারি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত নানা রকম বিদেশী বইয়ে। ঠাসা। কোথাও কোনো নতুন বই আর ভালো বইয়ের সন্ধান পেলেই তিনি ছেলেকে লেখেন আর ছেলে দেশ থেকে হোক বা বিদেশ থেকে হোক সে-বই সংগ্রহ করে মাকে পাঠাবেন। সবসময় লিখতেও হয় না, ছেলে নিজে থেকেও কোনো নতুন বইয়ের সন্ধান পেলে মায়ের জন্য কিনে ফেলেন। সুবল মিশ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মাকে এ-সব বই পড়তে দেখেছে-পড়ে পড়ে দাগ দিতে দেখেছে।

মহিলাকে প্রথম দিনই আমার ভালো লেগেছিল। সকলেরই লাগে শুনি। তার হাসিমাখা চোখ দুটিতে সকলের জন্যেই যেন স্নেহ সঞ্চিত। কথাবার্তা স্বচ্ছ, স্পষ্ট। বড়লোকের স্ত্রী ছিলেন নাকি, আর মস্ত বড়লোকের মা তো বটেই। তার। এ-রকম অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা মানুষকে কাছে টানবে তা আর বিচিত্র কি! ছুটি। ফুরোলে ছেলে যখন সপরিবারে কলকাতা, ফেরেন তখনো তার মায়ের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাঁর মা এই তিন চার মাইল জোড়া গোটা এলাকার অজস্র লোকের। মা। বাড়িতেও বারোমাস কটি দরিদ্র ছেলে থাকে। তাছাড়া কাজকর্ম করার লোকজন তো আছেই।

মহিলা বিধবা। কোরা বা এমনি সাদা থান পরেন না কখনো। সর্বদাই তসরের বা মুগোর থান পরেন। এও সুবল মিশ্রর মুখে শোনা। কতজনে কত দামী তাঁতের থান এনে মাকে প্রণাম করে যায়। মা সে-সব গরিব দুঃখী বিধবাদের চুপিচুপি বিলিয়ে। দেন। এমনি থান পরতে দেখলেই নাকি তার ছেলের মুখ ভার হয়। অতএব ছেলের যেভাবে মাকে সাজিয়ে আনন্দ সেইভাবেই সাজেন তিনি।

ছেলের এই পছন্দের সঙ্গে আমি নিজেও দ্বিমত হতে পারিনি। সত্যিই এই বেশে ভারি সুন্দর দেখায় তাঁকে। সামনে এলে প্রথমেই মনে হয় না তিনি বিধবা। শুচিস্নিগ্ধ এই বেশ দেখলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

ওষুধপ্রার্থী আর উপদেশপ্রার্থীদের বিদায় দিয়ে তিনি আমার দিকে ফিরলেন। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আছে তো গল্প, তুমি লিখবে?

আমি অপ্রস্তুত। সুবল মিশ্রর পুলকিত বদন। নামী ব্যারিস্টার ছেলের মুখে বিড়ম্বনা গোপনের প্রয়াস। তার স্ত্রীর মুখে কৌতুকব্যঞ্জনা।

মা আবার বললেন, সেদিন তুমি চলে যাবার পর বউমা বলছিল, লেখক হিসেবে তোমার নাকি খুব নাম-ডাক, তোমার অনেক গল্প-উপন্যাস ওর পড়া। এখন তো দেখছি ও ঠিকই প্রশংসা করছিল, দিব্বি চোখ আছে–গল্প যে আছে সেদিন একঘণ্টা এখানে বসেই তুমি বুঝলে কি করে?

তামাসা করছেন কিনা বোঝা গেল না, কারণ সুবল মিশ্রর মুখে মহিলাটির হাসি কৌতুকের গল্পও শোনা আছে। বললাম, আর লজ্জা দেবেন না।

তিনিও হেসে উঠলেন, লজ্জা কি, অনুভব করার মত চোখ আর মন আছে বলেই ধরে ফেলেছ–উল্টে বাহাদুরীর কথা তো! হাসিমুখে তিনি ছেলের বউয়ের দিকে তাকালেন একবার, তারপর আবার বললেন, ওই বউমাকে যদি ভালোমত ধরতে পারো, একটা গল্প পেয়েও যেতে পারো–তবে তোমাকে খুব সাবধানে লিখতে হবে, ও গল্প লিখতে না পারুক বাড়িয়ে বলতে ওস্তাদ।

ছেলের বউয়ের নাম ঊর্মিলা। বছর সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হবে বয়েস। ইনিও মন্দ সুশ্রী নন, তবে তার রূপবান স্বামীটির তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের তুলনায় অনেক বেশি হাসিখুশী। এই গুণেরও একটা রূপ আছে। শাশুড়ীর কথায় লজ্জা পেলেন হয়ত, কিন্তু ঠিক দেখলাম কিনা জানি না, তার দিকে চেয়ে একটা চাপা উদ্দীপনার আভাসও চোখে পড়ল যেন।

মায়ের হাসিমাখা দৃষ্টি এবারে ছেলের মুখখানা চড়াও করেছে।–ও কি! তোর মুখ অত গম্ভীর কেন? পাছে মায়ের ঠুনকো মর্যাদায় ঘা পড়ে সেই ভয়ে বুঝি?

এবারে ছেলে অপ্রস্তুত। হেসেই জবাব দিলেন, তোমার মর্যাদায় ঘা দিতে হলে এঁকে কলম ছেড়ে অন্য কিছু ধরতে হবে।

মা-টি ছদ্মগাম্ভীর্যে তক্ষুনি আমার দিকে ফিরলেন, থাক বাবা, তোমার লিখে কাজ নেই, কোর্টে কাড়ি কাড়ি মিথ্যের ব্যবসা করে তো ও আগে থাকতেই ওর বউকে চাটুর রাস্তায় চালাতে চাইছে, আর কানাকড়িও সত্যি পাবে না তুমি–এর পর বউমা বলে যদি কিছু, আমার কাছে যাচাই করে নিও।

.

ফেরবার পথে সুবল মিশ্র বলল, আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই ধরেছ –মায়ের জীবনে কিছু একটা ব্যাপার আছে।

-মনে হচ্ছে কেন?

-মায়ের কথা শুনে আর ওই ছেলে আর ছেলের বউয়ের হাবভাব দেখে।

একটু বাদে নিজে থেকেই জানালো, মাকে এখানে স্কুলে সক্কলে ভালবাসে, ভক্তি করে, আপদে-বিপদে ছুটে আসে তার কাছে। মায়ের সর্বদাই হাসিমুখ আর সর্বদাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। বিশেষ করে ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী এলে তো কথাই নেই। যত হাসিখুশী তত ব্যস্ত।..কিন্তু একদিন মায়ের সে-এক অদ্‌ভূত মূর্তি দেখেছিল সুবল মিশ্র। কার মুখে শুনেছিল, মায়ের একটু জ্বর-ভাব হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দিন দেখতে যাওয়ার ফুরসত মেলেনি। সময় হল রাত আটটার পরে। শীতকাল। তখন। ঘরের মধ্যেই হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি, নেহাত দায়ে না ঠেকলে বাইরে কেউ বেরোয় না। কিন্তু সুবলের ভিতরটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তার পরদিনই বড় লেন-দেনের ব্যাপার আছে একটা। এর মধ্যে মায়ের শরীর খারাপ শুনেও যাওয়া হল না বলে খুঁতখুতুনি আরো বেড়েই গেল। শেষে আপাদমস্তক গরম পোশাকে নিজেকে মুড়ে, সাইকেল আর টর্চ নিয়ে বেরিয়েই পড়ল সে। মা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন, খবরটা তো নিয়ে আসতে পারবে!

www.bengaliebook.com

কিন্তু গিয়ে দেখে, বাড়িতে যারা থাকে তারাই ঘুমুচ্ছে–বাইরের ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে একজন চাকর বসে। চাকরটা জানালো, মা তখনো পুজোর ঘর থেকে বেরোননি।

কি খেয়াল হল, পায়ে পায়ে সুবল ভিতরে ঢুকল। মায়ের বাড়িতে অন্দরমহল বলে কিছু নেই। ভিতরে আগেও দুই একবার এসেছে। পুজোর ঘরের দরজার এক পাট খোলা। গিয়ে যে দৃশ্য দেখল ভোলবার নয়। গোবিন্দজীর বিগ্রহের সামনে মা দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ বোজা। সেই হাড়কাঁপানো শীতে মায়ের গায়ে একটা গরম জামা বা চাদর পর্যন্ত নেই। তসরের থানের আঁচলটা শুধু গায়ে। জড়ানো। কিন্তু মা যেন পাথরের মূর্তি। একটু কাঁপছেন না, একটু নড়ছেন না–নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও নিচ্ছেন কিনা খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। সেই পাথরের মূর্তির দুই গাল বেয়ে অজস্রধারে. ধারা নেমেছে।

হতবুদ্ধির মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সুবল মিশ্র খেয়াল ছিল না। কম করে আধঘণ্টা হবে। ঠায় দাঁড়িয়ে সেই এক দৃশ্য দেখেছে সে। মায়ের সমস্ত দেহে কোনো অনুভূতির লেশমাত্র নেই। কেবল ওই নীরব নিঃশব্দ কান্না ছাড়া। কেঁদে কেঁদে মা। বুঝি নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় না করা পর্যন্ত ওমনি চোখ বুজে হাত জোড় করে গোবিন্দজীর সামনে দাঁড়িয়েই থাকবেন।

যেমন এসেছিল সুবল মিশ্র তেমনি নিঃশব্দেই ফিরে গেছে।

.

মাতৃকুটীতে আমার আনাগোনা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল।

মায়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি ব্যস্ত থাকলে ব্যারিস্টার মহানন্দ ঘোষের সঙ্গে গল্প করি। তার স্ত্রী ঊর্মিলার সঙ্গে কথাবার্তা গল্পগুজব আরো বেশি হয়। মা তাও এক এক সময় লক্ষ্য করেন আর মুখ টিপে হাসেন। কখনো বা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার গল্প কতদূর এগোলো?

গল্প এগোচ্ছে কিনা সেটা আমি জানি আর ঊর্মিলা জানেন। একজনের জানার আগ্রহের সঙ্গে আর একজনের জানানোর আগ্রহ মিলেছে। কিন্তু

সোজাসুজি আমি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না, তিনিও সরাসরি কিছু বলেন না। এই জানা আর জানানোর মধ্যে কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট অথচ অনায়াসে একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে। যেন। কথাপ্রসঙ্গে কথা ওঠে, যেটুকু বললে চলে, তিনি হয়ত তার থেকে একটু বেশি বলেন। আর যেটুকু শুনলে কৌতূহল মেটে, আমি তার থেকে একটু বেশি শুনতে চাই।

মাকে নিয়ে সত্যিই কিছু লেখা হবে কিনা ঊর্মিলা নিঃসংশয় নন। কিন্তু আগ্রহ যে তাঁরই সব থেকে বেশি সেটা সহজেই বোঝা যায়। কথার মাঝে থমকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, সত্যিই আপনি লিখবেন নাকি কিছু?

মৃদু হেসে ব্যারিস্টার সাহেব আমাকে সতর্ক করেছেন, লিখতে গিয়ে আপনি মশায় না ফ্যাসাদে পড়ে যান, মাকে যিনি চেনাচ্ছেন আপনাকে, তিনি নিজেই কিন্তু অন্ধ

ঊর্মিলা হাসিমুখেই রাগ করেছেন, বেশ, তুমিই তাহলে ভদ্রলোককে সাহায্য করো না একটু, মা তো পারমিশন দিয়েইছেন!

হাসির মধ্যে মহানন্দ ঘোষকে অন্যমনস্ক হতে দেখেছি। একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, মানুষের ভিতরটা বড় বিচিত্র ব্যাপার, কখন কোন ছোঁয়া লেগে কি কাণ্ড যে ঘটে যায়!...আমার এই মাকে দেখা, আকাশ দেখার মতই সহজ, কিন্তু চেনা বড় কঠিন। কথা কটা বলেই আত্মস্থ হয়ে হেসেছেন আবার, বলেছেন, জোড়া অন্ধের। হাতে পড়ার থেকে এক অন্ধের হাতে পড়াই নিরাপদ আপনার পক্ষে।

তবু কথাপ্রসঙ্গে হোক বা জ্ঞাতসারেই হোক, সাহায্য তিনিও করেছেন আমাকে। যেটুকু আমি পেয়েছি তাই দুর্লভ মনে হয়েছে।

ছুটি ফুরোতে ব্যারিস্টার সাহেব সপরিবারে কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। আমার আরো আগেই ফেরার কথা ছিল। শিগগীরই ফিরব শুনে তাঁরাও সাগ্রহে আমাকে তাদের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কবে যাবার সময় হবে যে শুধু আমিই জানতাম।

তারা চলে যাবার ঠিক চার দিন বাদে সন্ধ্যার পর আমি মায়ের কাছে এলাম। একা। মা তখন পুজোর ঘরে যাবেন বলে পা বাড়িয়েছেন। আমাকে দেখে দাঁড়ালেন।–সুবল বলছিল, তুমি দুই-একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছ?

–হ্যাঁ, কাল যাব ভাবছি।

মা সাদা মনে বললেন, তাহলে তো নন্দদের সঙ্গে গেলেই পারতে, এত পথ একা-একা যেতে কষ্ট হবে।

-আপনার জন্যেই থেকে গেছি, আপনি বলেছিলেন লেখা যাচাই করিয়ে নিতে।

মায়ের মুখে প্রথমে বিস্ময়, পরে কৌতুক-মাধুর্যের নীরব বিন্যাস দেখলাম আমি। তার চোখে হাসি, মুখে হাসির আভাস।

-সত্যি লিখেছ নাকি?

আমি মাথা নাড়লাম- সত্যি।

–আচ্ছা, এসো।

আমাকে সঙ্গে করে সোজা পুজোর ঘরেই ঢুকলেন তিনি। তার আসন পাতাই ছিল, অদূরে আর একখানা আসন পেতে দিলেন।–বসো, এখানে বসেই শুনি কি লিখেছ!

আমি যা লিখেছি সেটা আর যাই হোক চমকপ্রদ গল্প কিছু নয়। হৃদয়ের চিত্র বলা যেতে পারে। তবে বিচিত্র বটে।

আমি পড়ছি। বাহুল্যবর্জিত খুব সংক্ষেপে আঁকা চিত্র। অদূরের আসনে বসে মা নিষ্পলক আমার মুখের দিকে চেয়ে শুনছেন।

.

ঘটনার প্রথম পটভূমি এখানেই। এই মাতৃকুটীরের জায়গায় যে ভাঙা বাড়ি ছিল, সেখানে। বাড়িতে থাকতেন বৃদ্ধ দ্বিজেন গাঙ্গুলি আর তার মেয়ে মনোরমা। বয়েস হিসেব করলে দ্বিজেন গাঙ্গুলিকে প্রৌঢ় বলা যেত। অবশাঙ্গ রোগী তিনি, অকালে বার্ধক্য এসেছে।

কলেজের খাতায় মনোরমার নাম ছিল। কিন্তু যেতে কমই পারতেন। প্রথম বাধা বাপের ব্যাধি, দ্বিতীয় বাধা মেয়ের রূপ, তৃতীয় বাধা তার মেজাজ। রূপের কারণে স্তাবকদের অত্যাচার আর মেজাজের কারণে প্রায়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব। অসচ্ছল ঘরের রূপের প্রতি মানুষের লোভ বেশি অশালীন হয়ে উঠতে চায়। আর সেই রূপের ওপর মেজাজের ছটা দেখলে তাদের আচরণ আরো বেশি জ্বর হয়। মনোরমা কলেজে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়।

(এইটুকু পড়েই আমি মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর মুখ নির্লিপ্ত, ভাবলেশশূন্য।)।

ওই ভাঙা বাড়িতে নতুন একজনের পদার্পণ ঘটল একদিন। কলকাতার প্রেমানন্দ ঘোষ। সবে ল ফাইন্যাল দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহপাঠী রণদা চ্যাটার্জীর সঙ্গে আসামে বেড়াতে এসেছেন। রণদা চ্যাটার্জীর বাবার তখন আসামে কর্মস্থল।

বন্ধুকে সঙ্গে করে রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখতে এসেছেন। পাড়ার সম্পর্কে কাকা। কাকার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গরা এখনো তাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এক গাঙ্গুলি কাকাই শুধু সকলের সংস্রব ছেড়ে ওই বাড়িতে বাস করছেন ওই মেয়ের জন্মেব আগে থেকে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে তার পোষায়নি। কিন্তু বাড়ি ছাড়লেও রণদা চ্যাটার্জীর বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে হৃদতা এবং যাতায়াত।

রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখলেন এবং তাঁর শয্যার পাশে বসে সুখদুঃখের কথা কইতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ির আর একজনকে দেখলেন বার কয়েক, এবং দেখে সারাক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকলেন। সকলের অগোচরে দুচোখ তার এই ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে উঁকি-

www.bengaliebook.com

ঝুঁকি দিতে লাগল। যাঁকে এই ঘরের মধ্যে দুই একবার দেখেছেন তাকে আবার দেখার জন্য তার নির্বাক দৃষ্টি থেকে থেকে উসখুস করে উঠতে লাগল।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি প্রেমানন্দ ঘোষের নামধাম লেখাপড়া ইত্যাদির খোঁজখবর নিলেন। প্রেমানন্দকে লক্ষ্যও করলেন ভালো করে। লক্ষ্য অনেকেই করে থাকে, অমন সুন্দর চেহারা শতেকে চোখে পড়ে না। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি উঁচু লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। দেখে দুচোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল দ্বিজেন গাঙ্গুলির। এরপর বার কয়েক মেয়েকে তিনি ঘরে ডাকলেন–চা-জলখাবার দেবার জন্য, পেয়ালা নিয়ে যাবার জন্য, মশলা দিয়ে যাবার জন্য।

তারপর রণদার উদ্দেশে অনুযোগ করলেন, আমাকে একটি ভালো ছেলে দেবার জন্য কলকাতায় তোমাকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছি, কিছুই তো করলে না, এদিকে আমার এই হাল, কবে আছি কবে নেই, আর সুযোগ পেয়ে বাজে লোকে হামলাও করে, দুর্ভাবনায় আমি ঘুমুতে পারি না জানো?

বাড়ি থেকে বেরিয়েই রণদা চাটুজ্যে প্রেমানন্দর জেরায় পড়লেন।-মেয়ের জন্য ভদ্রলোক আসলে তোমাকেই চান বোধ হয়?

-না।

–কেন? তুমি দুর্লভ?

–না, ওই মেয়ে আমার দুর্লভ। মেয়ে রাজী হলে সকলের অমতেই বিয়ে করতুম।

–আশ্চর্য! মেয়ে রাজী নয়?

-প্রস্তাব দিইনি কখনো, দিলেও রাজী হবে না। মেয়ের দোষের মধ্যে মেজাজ কড়া।

–কেন রাজী হবে না কেন, তুমি যোগ্য নও?

www.bengaliebook.com

-একটু বেশি যোগ্য বলে। মনোরমা বামুনের মেয়ে নয়, কায়স্থ। তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তো বলো, দ্বিজেন কাকা আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।

প্রেমানন্দ ঘোষের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল বুঝি। স্তব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, মেয়েটি তাহলে তোমার দ্বিজেন কাকার মেয়ে নয় বলছ?

-না। তবে মেয়ের থেকে ঢের বেশি।

রণদা চ্যাটার্জী এরপর খোলাখুলিই বলেছেন সব। কারণ তিনি অনুমান করেছেন মনোরমার রূপ দেখে বন্ধুর মাথা ঘুরেছে, আবার বন্ধুর রূপ দেখে ওদেরও মাথা ঘোরা বিচিত্র নয়। নইলে গাঙ্গুলি কাকা অত আগ্রহ নিয়ে খোঁজখবর করছিলেন কেন?

যা তিনি নিবেদন করলেন, তার ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জটিল একটু। বয়েস কালে দ্বিজেন গাঙ্গুলি ভয়ানক বেপরোয়া ছিলেন আর তার চরিত্রেরও দুর্নাম ছিল। মদ-গাঁজা খেতেন, গান-বাজনা করতেন। পৈতৃক জমিদারির আয় ছিল, তাতেই চলে যেত। আজকের এই ব্যাধিও সে-সময়ের অপচয়ের ফল বলেই অনেকে সন্দেহ করেন।

এক বড়লোকের মেয়েকে মনে ধরেছিল তার। তাকে সত্যিই ভালোবাসতেন। মেয়েটি ঘৃণা করতেন তাকে, কিন্তু তার গান পছন্দ করতেন। সেই বাসনায় মোহগ্রস্ত। মেয়ের দাদার বন্ধু ছিলেন গাঙ্গুলি কাকা। তারা কায়স্থ। তবু সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। ফলে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ, গাঙ্গুলি কাকার বাড়িতেও এ নিয়ে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা। সব বাধা উপেক্ষা করে ওই মেয়েকে নিয়ে পালানোর ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি টের পাওয়ার ফলে ষড়যন্ত্র বানচাল। আর তা প্রকাশ হবার ফলে গাঙ্গুলি কাকার অদৃষ্টে দ্বিগুণ লাঞ্ছনা।

মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। বড়লোকের বাড়িতেই বিয়ে হল। অনেক দূরে, আসামের বাইরে।

www.bengaliebook.com

আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে গাঙ্গুলি কাকা এই বাড়িতে এসে আস্তানা নিলেন। আর আত্মঘাতী আনন্দে, অপচয়ের পাঁকে ডুবতে লাগলেন।

বছর দেড়েক বাদে সকালে ঘুম ভেঙে দেখেন, তার শয্যার একধারে দেড়মাসের একটা মেয়ে ঘুমুচ্ছে। রাতের নেশার ঘোর কাটেনি কিনা বুঝলেন না। চোখ কচলে আবার দেখলেন। সত্যিই মেয়ে একটা!

রাতে ঘরের দরজার কপাট খোলা রেখেই শোন তিনি। কোন্ বাড়ির মেয়ে, কে কখন এসে রেখে গেল! মেয়ের হাতে বাঁধা একটা ভাজকরা কাগজ চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি সুতোটা ছিঁড়ে নিয়ে খুললেন সেটা। ছোট্ট চিরকুট!–দয়া করে রেখো ওকে। নিরুপায় হয়েই তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম। কেউ জানবে না।–মণিমালা।

সেই মেয়ের নাম মণিমালা।

গাঙ্গুলি কাকা হতভম্ব। অনেক ভেবে একসময় মণিমালার বাপের বাড়ি গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ না করেও বুঝলেন, সেখানে কেউ তার খবর রাখে না। ভাবতে ভাবতে গাঙ্গুলি কাকা ফিরে এলেন।

এর ঠিক তিন দিন বাদে কাগজে মণিমালার আত্মহত্যার খবর বেরুলো। তার নাকি মাথাখারাপ হয়েছিল। আত্মহত্যা করার আগে নিজের মেয়েকেও হত্যা করে। গেলেন লিখেছেন। কিন্তু সেই শিশুর দেহের কোনো সন্ধান মেলেনি।

কেন এরকম একটা ব্যাপার ঘটল সেই রহস্য আজও অগোচর।

ঘরে একটা শিশু পুষছেন, ছমাসের মধ্যেও গাঙ্গুলি কাকা সেটা বাইরে কাউকে জানতে দিলেন না। পরে সকলে জানল, গাঙ্গুলি কাকারই মেয়ে, কোথায় কি কাণ্ড করে বসেছিলেন, এ তারই ফল।

সেই শিশুকন্যাই এই মনোরমা।

গাঙ্গুলি কাকার বাড়িতে প্রেমানন্দ ঘোষের যাতায়াত বেড়েছে। পরে সেটা দুবেলায় দাঁড়িয়েছে। মনোরমাকে যত বেশি দেখেছেন তিনি তত বেশি নিজেকে হারিয়েছেন। হারাবার নেশাতেই আবার ছুটে এসেছেন। কিন্তু ভিতরে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। রক্ষণশীল পরিবার তাদের, বাপ সাধারণ উকীল, চেহারার জোরে ছেলে দেখেশুনে শাঁসালো মুরুব্বি ধরবে–ঘরে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আসবে–সেই আশায় আছেন। অতএব দুর্ভাবনার কারণ বইকি তার। কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলির বাড়ি এলে তার সব ভাবনা-চিন্তা নিঃশেষে তলিয়ে যায়। দুনিয়ার বিপ্ন ঠেলে সরিয়ে ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে তুলতে চান তিনি।

ফেরার দিন দশেক আগে ঘোষণা করলেন, মনোরমাকে বিয়ে করবেন। শুধু তাই নয়, একেবারে বউ নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। এ প্রস্তাবে আপত্তি একমাত্র রণদা। চ্যাটার্জী তুলেছিলেন, সেটা ঠিক হবে না, আগে বাবা-মাকে জানানো দরকার।

প্রেমানন্দ বলেছেন, তাহলে বিয়ে হবে না, তারা রাজী হবেন না।

অন্য কেউ হলে আপত্তি করতেন, কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলি সেই চরিত্রের মানুষ যিনি অন্য কারো মতামত বা অনুমোদনের গুরুত্ব দেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রেমানন্দ মেয়ের সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন কিনা। আর বিয়ে করলে আর কিছু যে প্রাপ্তির আশা নেই তাও তিনি স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

উকীলের ছেলে প্রেমানন্দ টাকা চেনেন, টাকার প্রতি তার টানও আছে। কিন্তু তখন সমস্ত চিন্তা তার একটাই। বলেছেন, আর কিছু তিনি আশা করেন না।

বিয়ে হয়ে গেল। এমন অনাড়ম্বর বিয়ে প্রেমানন্দ কল্পনাও করতে পারেন না। তবু তখনকার মত আত্মবিহ্বল তিনি।

মনোরমাকে নিয়ে যেদিন কলকাতায় রওনা হবেন, তার আগের দিন রাত্রিতে দ্বিজেন গাঙ্গুলি মানুষটিকে সত্যিই চেনা গেল। মনোরমাকে তিনি

আদেশ দিলেন–ভারী কাঠের সিন্দুকটা খুলতে আর তার ভিতরে একটা উবুড় করা বড় হাঁড়ির মধ্যে যে শাড়ি জড়ানো বড় পুটলিটা আছে, সেটা নিয়ে আসতে।

নির্দেশ পালন করা হল। পুঁটলি খুলতেই চক্ষুস্থির প্রেমানন্দ ঘোষের। একরাশ পুরনো ধাঁচের সোনার গয়না।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি বললেন, বিশ বছর আগের পঁচিশ হাজার টাকার গয়না এখানে, এখন এর দাম কম করে পঁয়তিরিশ হাজার হবে–খুব সাবধানে নিয়ে যাও!

প্রেমানন্দ হতভম্ব। সত্যি দেখছেন বা সত্যি শুনছেন কিনা সেই সংশয়। দ্বিজেন গাঙ্গুলি আবার বললেন, এসবই ওর, পাছে গয়নার লোভে কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় সেজন্যে বলিনি। দেড়মাস বয়সে ওর মা শুধু ওকেই রেখে যায়নি ওর মাথার কাছে এই পুঁটলিটাও রেখে গেছল।

.

কলকাতা।

প্রেমানন্দর বাবা মা বা আত্মীয় পরিজন কেউ এ বিয়ে ক্ষমার চোখে দেখেননি। বউ রূপস্রী সেটা সকলেই দেখেছেন, এমন রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না, কিন্তু এই রূপের পিছনে কাটার ছায়াও দেখেছেন সকলে। এমন রূপসী মেয়েকে এভাবে কে গছিয়ে দেয়? যে-লোক ছেলের বাপ-মায়ের অনুমতি না নিয়ে এ-ভাবে মেয়ে পার করল, সেই লোককে ভালো বলা যাবে কেমন করে? আর ভালো না হলে তারই আশ্রয়ে ছিল যখন–এই মেয়েই বা কেমন?

প্রেমানন্দ নিজের বাড়িতে চোরের মত কাটালেন কিছুদিন। উত্তেজনা একটু থিতিয়ে আসতে সব খুলে বলে মা-কে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। ফল তাতে আরো বিপরীত হল। মা-টা কেন আত্মহত্যা করল? মায়ের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল? একজন পর-পুরুষের বাড়িতে মেয়ে ফেলে রেখে গেল কেন?

যাক, বাড়ির কর্তা পঁয়তিরিশ হাজার টাকার গয়না পাওয়া গেছে শুনেই হয়ত শেষ পর্যন্ত ত্যজ্যপুত্র করলেন না ছেলেকে। মোট কথা, ওই গয়না ছাড়া আর কিছুই পছন্দ হল না প্রেমানন্দর বাবা-মায়ের।

তবু মনোরমা যতদিন মুখ বুজে ছিলেন, একরকম কেটেছে। মুখ খুলতেই গণ্ডগোল শুরু হল। দুমাস না যেতেই বউয়ের এক-এক সময় উগ্র মূর্তি দেখে বাড়ির মানুষেরা তাজ্জব। অন্যায় কিছু কানে এলে মনোরমা ফুঁসে ওঠেন। আর কানে তো হরদমই আসছে। বউ সহ্য করে না বলে প্রেমানন্দও বিরক্ত। কখনো বা ক্রুদ্ধ। তারও ফল বিপরীত। কাপুরুষের মত স্বামী অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় বলে তার ওপরেও এক এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনোরমা।

বউয়ের সাহস আর স্পর্ধা দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তারা সাহস দেখেন; স্পর্ধা দেখেন। কথার জবাবে কথা বললে রাগে সাদা হয়ে ওঠেন তারা। আর সবকিছুর অবধারিত গঞ্জনার ঝাঁপটা এসে পড়ে প্রেমানন্দর ওপর। বেচারা নতুন উকীল, পসারের চেষ্টায় মাথা ঘামাবেন কি, বাড়ির অশান্তিতে নাজেহাল। ফলে বউয়ের ওপরেই ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

এদিকে রণদা চ্যাটার্জী ঘন ঘন বাড়িতে আসেন আজকাল। তার সঙ্গে অমন দেমাকী আর অতি রাগী বউয়ের সম্প্রীতি একটুও সুনজরে দেখেন না শ্বশুর-শাশুড়ী। ওদিকে এই একমাত্র মানুষকে বেশ সমীহ করতে দেখে প্রেমানন্দর নিভৃতের চিন্তাও বিকৃত রাস্তায় চলতে শুরু করল। মনোরমা রাজী হলে জাত-বর্ণের রাধা বা বাপ মায়ের আপত্তি তুচ্ছ করেও বিয়ে করতে আপত্তি ছিল না রণদার, এ তো তার নিজেরই মুখেই শুনেছেন। সামনা-সামনি বন্ধুর সঙ্গে কোনো বিবাদের সূচনা হল না বটে, কিন্তু অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল।

শেষে তুচ্ছ কারণেই দপ করে জ্বলে উঠল একদিন।

কোন এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পৈতের নেমন্তন্ন ছিল সকলের। প্রেমানন্দ সকালে উঠেই সেখানে চলে গেছেন। বউকে নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীরও সকাল-সকালই যাওয়ার কথা। কিন্তু মনোরমা জানালেন, তাঁর শরীর ভালো না, তিনি যাবেন না।

বউ সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা, শরীর ভালো নাও থাকতে পারে, শ্বশুর-শাশুড়ী তার আপত্তিতে কান দিতে চাইলেন না। হুকুম করলেন, যেতে হবে। মনোরমা শাশুড়ীকে জানালেন তার যাওয়া সম্ভব হবে না।

ছুটির দিন। এর একটু বাদে রণদা এলেন গল্প করতে। শ্বশুর-শাশুড়ী দেখলেন বউ তার সঙ্গে দিব্বি কথাবার্তা কইছে।

নেমন্তন্ন বাড়িতে এসে ছেলেকে ডেকে তার বাবা নিজেদের অপমানের ফিরিস্তি দিলেন, আর রণদার সঙ্গে বসে বউ গপ্পসপ্প করছে জানিয়ে তাকে বললেন বউকে নিয়ে আসতে।

মাথার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড শুরু হল প্রেমানন্দর। ট্যাক্সি হাঁকিয়েই বাড়ি ফিরলেন তিনি। এসে অবশ্য দেখেন বউ একাই আছে। তবু যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করলেন। রণদাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না, একথাও ঘোষণা করলেন। আর বিয়ের নমাসের মধ্যে জীবনটা যে তাঁর অশান্তিতে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল সরোষে তাও বার বার বলতে বাকি রাখলেন না।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, অশান্তির শেষ হবে কেমন করে?

ক্রুদ্ধ গর্জনে প্রেমানন্দ জবাব দিলেন, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে চিতায় শুইয়ে দিতে পারলে? বুঝলে? সেই রাস্তা করে দিতে পারো?

মনোরমার দুই চোখেও তেমনি জ্বলন্ত আক্রোশ আর বিদ্বেষ। জবাব দিলেন না।

প্রেমানন্দ চিৎকার করে উঠলেন, তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবে কিনা আমি জানতে চাই!

মনোরমা বললেন, না।

প্রেমানন্দ চলে গেলেন, আর ফিরে এসে এর শেষ দেখবেন বলে গেলেন।

কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরে এসে বউকে আর বাড়িতে দেখলেন না কেউ। মনোরমা নেই, তার বড় ট্রাঙ্কটাও নেই।

বাড়ির মানুষেরা স্তম্ভিত।

দুমাস বাদে আসাম থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলির টেলিগ্রাম এলো, মনোরমা মারা গেছে।

ব্যস। বিয়ের এগারো মাসের মধ্যে একটা অধ্যায় শেষ।

প্রেমানন্‌দ জানেন না ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল কি আর কোনো কারণে? মনোরমার মা মণিমালা আত্মহত্যা করেছিলেন। মেয়েও তাই করল কিনা কে জানে?

বউয়ের জন্য এ-বাড়িতে শোক করার কেউ নেই। সংবাদের একঘণ্টার মধ্যে প্রেমানন্দর বাবা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাবার সময় বউমা সব কটি গয়না তো গুছিয়ে নিয়ে গেছলেন, সেগুলির কি হবে?

এরপর রণদাকেও ডেকে গয়নার কথা বলেছেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছেন, যাতায়াতের খরচ দিলে আসামে গিয়ে রণদা সেগুলি নিয়ে আসতে পারেন কিনা।

রণদা চ্যাটার্জী মাথা নেড়েছেন– পারেন না।

অগত্যা দিন পনের বাদে তিনিই বউয়ের গয়না চেয়ে অদেখা দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে চিঠি দিয়েছেন একখানা।

জবাব মেলেনি।

প্রেমানন্দ ঘোষের ধাক্কা সামলাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। গয়নার কথা শেষে তারও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। মাস চারেক বাদে দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে শেষে তিনিও চিঠি দিয়েছেন একখানা। লিখেছেন, তার নির্দেশ পেলে বউয়ের গয়না আনতে লোক পাঠাবেন, না নিজেই যাবেন।

নির্দেশ পাননি। জবাব আসেনি।

.

পরের যবনিকা উঠেছে পঁচিশ বছর বাদে। অ্যাডভোকেট প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, বাইরে জায়গাজমি কিনেছেন, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকাও জমিয়েছেন। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

সুমিত্রাকে বিয়ে করেছিলেন বউয়ের মৃত্যুসংবাদ আসার ছমাসের মধ্যে। সে সময়ের নামকরা সিনিয়রের মেয়ে। তা সে-ভদ্রলোক যতই বড়লোক হোন, তার আটটি মেয়ে। সুমিত্রা মাঝের দিকের একজন। অতএব প্রেমানন্দর প্রতি চোখ পড়েছিল তার। সুমিত্রারও পড়েছিল। সেদিক থেকে প্রেমানন্দর চেহারা প্রধান সহায়। ছেলেটা কালে-দিনে ভালো করবে এটা সিনিয়র ভদ্রলোক বুঝেছিলেন এবং বাড়িতে বুঝিয়েছিলেন। অতএব ঝঞ্ঝাটশূন্য প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের বাধাটা বড় হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় শ্বশুরের অনুমানে ভুল হয়নি। দেখতে দেখতে পসার বেড়েছে প্রেমানন্দর। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ সুমিত্রার সঙ্গেও খুব মনের মিল হল না প্রেমানন্দর। বিয়ের দশ বছর বাদেও ঠাট্টার ছলে রণদা চ্যাটার্জীকে শুনিয়েই সুমিত্রা বলেছেন, আপনার বন্ধুর মনমেজাজ ভালো থাকবে কি করে, প্রথম বউ মরার ছমাসের মধ্যে আবার বিয়ে করলেও তার স্মৃতিতে যে এখনো বুক ভরে আছে!

রণদা চাটুজ্জে টিপ্পনী কাটতেন, গয়নার স্মৃতিতে নয় তো?

যত হাসিমুখেই বলুন, জ্বালা ছিলই সুমিত্রার। দুজনের মতের মিল কমই হত, খিটিমিটি লেগে থাকত। অশান্তি বাড়তে থাকল ছেলেরা বড় হয়ে উঠতে। তিন ছেলে। বড় ছেলের তেইশ বছর বয়স, মেজ ছেলের একুশ,

ছোট ছেলের উনিশ। বাপের পয়সার দরুন হোক বা মায়ের প্রশ্রয়ের কারণে হোক–পড়াশুনা একজনেরও তেমন। হয়নি। তারা বড়লোকের ছেলে, বড়লোকের ছেলের মতই চাল-চলন। এই চাল-চলন দেখে অনেক রকম সন্দেহও প্রেমানন্দর মাথায় ঘোরে। সন্দেহ কেন, বড় দুই ছেলের সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ হতাশ। ছোটটাও দাদাদের রাস্তায় চলা শুরু করেছে।

সুমিত্রা ছেলেদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখতেন, ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাদের আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন। এই কারণেই সুমিত্রার সঙ্গে এক-একদিন তুমুল বচসা হয়ে যেত তার।

প্রেমানন্দর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। হঠাৎ কোর্টেই স্ট্রোক হয়ে গেল একদিন। চিকিৎসার দাপটে সেরে উঠলেন এ-যাত্রা, কিন্তু এখনো শয্যাশায়ী। ডাক্তার সতর্ক করেছেন, দ্বিতীয়বার হলে ভয়ের কথা। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাই বেশি দেখছেন। প্রেমানন্দ ঘোষ। হার্ট দুর্বল, প্রেসার হঠাৎ ওঠে হঠাৎ নামে। ভিতরে ভিতরে বিদায়ের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি।

এই প্রস্তুতির আভাস ছেলেরা পেয়েছে, সুমিত্রা পেয়েছেন। প্রেমানন্দ ঘোষের ধারণা ছেলেরা দিন গুনছে, বাপ চোখ বুজলে সব তাদের হাতে আসতে পারে। স্ত্রীর সামনেই রণদা চ্যাটার্জীকে সেদিন ডেকে বললেন, ছেলেদের ইচ্ছে কোথায় কি আছে না আছে তাদের বুঝিয়ে দিই, ওদের মায়েরও সে-রকমই ইচ্ছে কিনা জানি না কিন্তু ছেলেদের হাতে সব পড়লে ফল কি হবে ভগবান জানেন! তাই ভেবেছি একটা উইল করব, তুমি ব্যবস্থা করো–এঁর জন্যে অর্ধেক অন্তত আলাদা করে রাখব ঠিক করেছি।

রণদা চাটুজ্জে স্পষ্টই সুমিত্রাকে সচকিত হতে দেখলেন।

বন্ধুর কথার জবাব দিলেন না রণদা চ্যাটার্জী। গম্ভীর। অন্যমনস্ক। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আসাম থেকে কেউ দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে?

প্রেমানন্দ ঘোষ অবাক।-না তো, আসাম থেকে কে আসবে?

www.bengaliebook.com

–একটি ছেলে, এলে শুনো। তাড়া আছে, চলি।

চলে গেলেন। শুধু প্রেমানন্দ নয়, সুমিত্রাও বিস্মিত।

পরদিন। প্রেমানন্দ শুয়ে, তার সামনে বসে বেদানা ছাড়াচ্ছেন সুমিত্রা। বুড়ো চাকর এসে খবর দিল, সাহেবপানা একটি ছেলে কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান, বললেন, আসাম থেকে আসছেন–অসুখের জন্যেই দেখা করা বিশেষ দরকার।

প্রেমানন্দ ঘোষ ভেবে পাচ্ছেন না কে হতে পারে? অসুখের খবর রণদার কাছে জেনে থাকবে। বললেন, নিয়ে এসো

সুমিত্রা চলে গেলেন না অথবা যেতে পারলেন না। তাছাড়া বাড়ির কর্তার ঘরে একলা থাকা নিষেধ, আর বাইরের কেউ এলে বেশি কথা বলাও নিষেধ। চাকরের কথায় মনে হয়েছে- অল্পবয়সীই কেউ হবে।

যিনি এলেন তাকে দেখে ঘরের দুজনেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। হাজারের মধ্যে এরকম, চেহারা বড় দেখা যায় না। আর সাহেবপানাই বটে। তাকে দেখামাত্র প্রেমানন্দ ঘোষ কেমন বিমূঢ় যেন।

আগন্তুকের হাতে বড় চামড়ার ব্যাগ একটা। পরনে ট্রাউজার আর চকচকে হাফ শার্ট। তাতেই রূপ ঠিকরে পড়ছে। ব্যাগসুষ্ঠু হাত তুলে ঘরের দুজনের উদ্দেশেই নমস্কার জানালেন।

প্রেমানন্দ ঘোষ ইঙ্গিতে সামনের খালি চেয়ারটা দেখালেন।

চেয়ারে বসে হাতের মোটা ব্যাগের খুপরি থেকে ছোট্ট একটা মোড়ক বার করে আগন্তুক বললে, এতে একটা কবচ আছে, আপনার অসুখ জেনে আমার মা আপনাকে পরার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।

www.bengaliebook.com

প্রেমানন্দ এবং সুমিত্রা দুজনেই হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার…মানে তোমার মা আমার অসুখ জানলেন কি করে?

–মাস দুই আগে রণদা কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমিই শুনে গিয়ে। বলেছিলাম। মায়ের বিশ্বাস, এটা পরলে আপনার উপকার হবে।

-তা তোমার নাম কি বাবা?

–আমার নাম মহানন্দ ঘোষ।

কোন দুর্বোধ্য কারণে প্রেমানন্দ আর সুমিত্রা দুজনেই কি চমকে উঠলেন একটু?

সুমিত্রা চেয়েই আছেন ছেলেটির দিকে। তার কাছে ছেলের বয়সীই, বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়েস।

আত্মস্থ হয়ে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, রণদার সঙ্গে তোমাদের কতদিনের পরিচয়?

আমি গেলবারেই প্রথম দেখলাম।..বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যাপারে তার তদবির-তদারকে কোনরকম সুবিধে হয় কিনা, আলাপ করতে এসেছিলাম। আমার বাবার বিশেষ বন্ধু তিনি।

–তোমার বাবার নাম কি?

খুব ধীর স্পষ্ট জবাব এলো, আমার বাবার নাম প্রেমানন্দ ঘোষ।

আকাশ থেকে বাজ পড়ল একটা? নাকি সুমিত্রা আর প্রেমানন্দ দুজনেই স্বপ্ন দেখছেন? নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম প্রেমানন্দর। এত উত্তেজনা ভাল নয়। কিন্তু দুজনের কারোই তা খেয়াল থাকল না, খেয়াল শুধু মহানন্দ করলেন। বললেন, আপনি উত্তেজিত হতে পারেন ভেবে মা আমাকে আসতে দেবেন কিনা ভাবছিলেন।

প্রেমানন্দর গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। বিমূঢ় মুখে বললেন, কিন্তু তিনি তো পঁচিশ বছর আগে মারা গেছেন!

মারা যাননি। আপনি যা চেয়েছিলেন টেলিগ্রামে তাই শুধু জানিয়েছেন।

স্তব্ধ মুহূর্ত অনেকগুলো। প্রেমানন্দ ঘোষের নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক সক্রিয় হতে লাগল খুব আস্তে আস্তে। দু চোখের সমস্ত দৃষ্টি ঢেলে লক্ষ্য করছেন। ...ভাওতা নয়, হতে পারে। চেহারাই বলছে, হতে পারে। মায়ের মুখের আদল কি নিজের মুখের, জানেন না–কিছু একটা বড় বেশি স্পষ্ট। কিন্তু পঁচিশ বছর বাদে আজ হঠাৎ এই কবচ পাঠানো কেন? অসুখ বলে?...নাকি রণদার কাছে সঙ্কটের সময় উপস্থিত শুনে ছেলের জন্য কোনো সংগতির ব্যবস্থা চায়? ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনার উদ্দেশ্যও হতে পারে। অনেককাল ধরে আইন আর কোর্ট করে মানবচরিত্রের দুর্বলতা কিছু বেশিই জেনেছেন তিনি।

অপেক্ষা করছেন। চেয়ে আছেন।

মহানন্দ ঘোষ বললেন, বেশি বিরক্ত করব না, আর একটু কাজ সেরেই আমি যাব

বড় চামড়ার ব্যাগ খুলে মস্ত একটা প্যাকেট বার করে তার সামনে রাখলেন। –এতে আপনার সব গয়না আছে, মা স্কুলে মাস্টারি করে আমাকে মানুষ করেছেন, এর একটাও খরচ হয়নি। দিয়ে গেলাম—

বুকের ঠিক মধ্যিখানে প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগল যেন। সুমিত্রা মূর্তির মত বসে। প্রেমানন্দ ঘোষ ঘামছেন। পরক্ষণে উঠে বসতে চেষ্টা করে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

–এগুলো তোমার মা তোমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন?

-হ্যাঁ, এগুলোর জন্যে আপনি চিঠি লিখেছিলেন। মা তখন রাগ করেই দেননি। বোধ হয়।

-তা বলে আজ–আজ এই প্রতিশোধ নিল! প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমাকে দিয়ে এগুলো পাঠাতে পারল!

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি ধরে শুইয়ে দিলেন তাকে। প্রেমানন্দ ঘোষ কাঁপছেন থরথর।

একটু চুপ করে থেকে মহানন্দ বললেন, তিনি ঠিক পাঠাননি, তার ইচ্ছে বুঝে আমিই নিয়ে এসেছি। মায়ের কাছে এত গয়না দেখে আমি ভেবেছিলাম আমার জন্যেই রেখেছেন। বিলেত যাবার জন্য এগুলো চেয়েছিলাম। মা তখন বলেছেন ওগুলো। আপনার, আপনাকে ফেরৎ দেবেন বলে রেখেছেন। সব শোনার পরেও পাছে আবার আমার লোভ হয়, তাই এবারে আসার সময় নিয়ে এলাম।

আর কিছু বলার বা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালেন মহানন্দ ঘোষ।এরপর আপনার আরো ক্ষতি হতে পারে, আচ্ছা চলি—

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের বাইরে চলে এলেন তিনি। কিন্তু বাইরে এসেও প্রেমানন্দর আর্তস্বর শুনলেন। স্ত্রীকে বলছেন! দেখলে ব? শুনলে সব? এসব গয়না এখন তুমি নাও, তুমি দেখো, ছেলেদের দেখাও–খুব খুশী হবে, আমার শুধু এই কবচ থাক–বুঝলে? বুঝলে?

.

এই পর্যন্তই চিত্র।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। নিস্পন্দের মত বসে আছেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই হতভম্ব আমি। হঠাৎ সরোষে মা বলে উঠলেন ওই সুমিত্রার ওপরে তুমি পক্ষপাতিত্ব করেছ–তার ভিতরে অনেক বিষ ছিল–স্বামীর স্ট্রোক হবার পরে ছেলেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে সেও মনে মনে চাইছিল স্বামী উইল করে দিয়ে যাক–জানো?

তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বর। এমন মহীয়সী যিনি, এত তেজ আর এত ক্ষমা যাঁর মধ্যে, তাঁর এই রূঢ়তা আমি আশা করিনি। আঘাতই পেলাম যেন। বললাম,

আপনি নিশ্চয়ই রণদাবাবুর মুখে শুনেছেন এ-কথা, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি তো না-ও হতে পারে...।

মা নীরব একটু। নিজেকে সংযত করলেন। শান্ত কমনীয় আবার। একটু থেমে নিয়ে বললেন, গল্প মোটামুটি ঠিকই হয়েছে। কেবল তোমার ভাবনায় সামান্য একটু ভুল থেকে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছি।

তেমনি সহজ সুরেই তিনি আবার বললেন, আমি মনোরমা নই। সে ভাগ্যবতী সিথির সিঁদুর নিয়েই চোখ বুজেছে। আমি সুমিত্রা। আমি নির্বাক বিমূঢ় নিস্পন্দ কাঠ।

তিলে তিলে তিলোত্তমা

আজব শহরের আজব বাহার!

ঘড়ি ধরে সন্ধ্যা ছটায় খোলে, নটায় বন্ধ হয়। আশেপাশে প্রায় সকাল ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত যাদের দোকান খোলা, তারাও তখন ওদিকপানে চেয়ে থাকে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রাসাদোপম এই অট্টালিকায় অনেক ব্যবসায়ী অনেক রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিউটি হাউসের তিন ঘণ্টা ওদের তিরিশ ঘণ্টা।

সব রাস্তা রোমের দিকে। এখানে সব আগন্তুক বিউটি হাউসের দিকে। সসঙ্গিনী তিনঘণ্টা সিনেমায় কাটানো যায়, লাভার্স পার্কের আবছা আলোয় নিরিবিলিতে বসে তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার অবসান হতে পারে, হাত-ধরাধরি করে শিথিল চরণে মার্কেট প্লেসের শো-কেইস দেখেও ঘণ্টাতিনেক উতরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানকার এই তিন ঘণ্টার স্রোত একেবারে অন্য খাতে বইছে। এই তিন ঘণ্টায় মনো-বৈচিত্র্যের নিখুঁত নক্সা আঁকতে পারে, এমন লিপি-বণিক জন্মায়নি বোধ হয়।

রূপচর্যার জীবন্ত মিছিল। বিধাতার মার হার মেনেছে বিউটি হাউসের মার প্যাঁচের কাছে। খোদার ওপর খোদকারীর নমুনা দেখাচ্ছে বিউটি হাউস। বিউটি হাউস মুশকিল-আসান।

নারীপুরুষের বিচ্ছিন্ন সমাগম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বড় কেউ আসে না এখানে। অন্যের চোখে নিজেকে অভিরাম করে ভোলার তাগিদে কোঅপারেশন অচল।

প্রকাণ্ড হল। শাদা আলোয় মেঝেতে পুরু কার্পেটের রোঁয়া পর্যন্ত দেখা যায়। একদিকে সারি সারি শো-কেইসএ রঙ-বেরঙের প্রসাধনসামগ্রী সাজানো। সেসবের উপযোগিতা আর ব্যবহার বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে এক্সপার্ট সেলসম্যান। অন্যদিকে ছোট ছোট চেম্বার। হাতে-কলমে কলাকৌশল শেখানোর মহড়া চলেছে সেখানে।

বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়ায় যৌবনের জলুস আনা যেতে পারে।...কালোর চেকনাই ছোটানো যেতে পারে শাদা চুলে।...তোবড়ানো গাল ভরাট দেখাবার উপকরণ পেতে হলে এখানে আসতে হবে। ...এখানে আসতে হবে প্লাস্টার-পালিশে বাঁকাচোরা বিকৃত দাঁতে কুন্দ-দন্তের শোভা আনার কৌশলটি জানতে হলে। পটলচেরা চোখ বা কোকড়ানো চুল চাই তো এসো বিউটি হাউসে।–শুধু এখানকার উপকরণ আর পনের দিনের ট্রেনিং-এর পরে মুখের ওপর সার্চলাইট ফেললে প্রসাধন যদিও বা ধরা পড়ে, আসল রঙটি ধরা যাবে না। শোনা যায়, এ বিদ্যে শেখানোর জন্য প্যারিস থেকে ট্রেইনার ধরে এনেছে দোকানের মালিক ভাটনগর। নিরুৎসুক-জনের খটকা লাগতে পারে, যে-দেশে কালো রঙের সমস্যা নেই, সে-দেশে অমন এক্সপার্ট গজায় কি করে? কিন্তু নিরুৎসুক-জনকে নিয়ে কারবার নয় বিউটি হাউসের।

চটপটে ছটফটে মানুষ ভাটনগর। হাসছে গল্প করছে তদবির-তরক করছে। নতুন খদ্দের দেখলেই বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়, সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় নিজের নিরিবিলি বসবার জায়গাটিতে। গভীর সহানুভূতিতে সমস্যা শোনে, মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধান বাতলে

দিয়ে আশ্বস্ত করে তারপর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টেপে। প্যাক করে শব্দ হয় একটা। বেয়ারা দৌড়ে আসে।

–সাবকো (অথবা মেমসাবকো) …নম্বর কামরা দেখাও।

পুরানো বা চেনা-জানা খদ্দেরের সঙ্গে তার হাসি-খুশি-ভরা অন্তরঙ্গতায় ব্যবসায়ীর দূরত্ব নেই এতটুকু। কোনো ভদ্রলোকের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোচ্ছাসে বলছে, গ্রোইং ওয়ানডারফুলি ইয়ং স্যার! উত্তরতিরিশ কোনো মহিলাকে সবিনয় অভিবাদনে স্তুতি জানাচ্ছে, ইউ লুক হার্ডলি টুয়েন্টি মাদা!

যার রূপ আছে সেও আসে। যতটুকু আছে তার থেকে বেশি একটু থাকতে আপত্তি কি! আর যার নেই তার তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই যে এখানে এসে একেবারে রূপচয়নে বসে যায় বা তেমনি কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এমন নয়। সাধারণ প্রসাধনসম্ভারও হরদম বিক্রি হচ্ছে এখানে, যা আজকাল ঘরে ঘরে লাগে। সেব কেনার ছুতোয় কৌতূহল মেটাতে আসে অনেকে।

কিন্তু আরো একটা আকর্ষণ আছে বিউটি হাউসের।

স্বপ্না বোস।

দীপশিখা যেমন পতঙ্গ টানে, তেমনি ওরও অমোঘ একটা আকর্ষণ আছে। পিছনের দরজা দিয়ে গটগট করে ঢোকে যখন, মনে হয় এত বড় হল্টা ঝলমলিয়ে হেসে উঠল।

বিউটি হাউসের প্রধান আপ্যায়িকা স্বপ্না বোস।

কিন্তু অন্তরঙ্গ সকলেরই বিশ্বাস, শুধু কর্মচারিণী নয়, ব্যবসায়ের কলকাঠিও এই মহিলাই আগলে বসে আছে। আর ধারণা, স্বপ্না বোস ছাড়া ভাটনগরের জীবন জোয়ারেও চড়চড় করে ভাটা নেমে আসবে। অনেকের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। বোস পদবীটা এখনো রেখেছে ব্যবসায়ের আবহাওয়ায় রোমান্স ছড়াবার জন্য, নইলে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য, মেয়েদের সঙ্গে পর্যন্ত ভারি সহজ একটা হৃদ্যতা ওর যা হবার কথা নয়। তারা আসে রূপচয়ন করতে। এ নারী রূপেরই জীবন্ত উৎস। ঈর্ষা হবার কথা, কিন্তু হয় না। বরং সলা-পরামর্শ নির্দেশ-উপদেশের জন্য ওরই কাছে মন খুলে দেয়। তারা। ওকে দেখে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করতে নবাগতদের হয়ত একটু সঙ্কোচ হয়, হয়ত বা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে চাপা নিঃশ্বাসও পড়ে দুই-একটা। কিন্তু যাদু জানে স্বপ্না বোস। হেসে, জড়িয়ে ধরে, কানে কানে কথা বলে, নিরিবিলি চেম্বারে টেনে নিয়ে গিয়ে মনের কথা শুনে আর মনের মত কথা শুনিয়ে বৈষম্যের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত ধুয়ে-মুছে দেয়।

পুরুষদের সঙ্গে অবশ্য স্বপ্না বোসের রীতিনীতি ভিন্ন। এদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে যারা আসে, তারা আর যাই হোক ওর কাছে আসে না। তারা সোজা যায় ভাটনগরের কাছে, নয়ত তার অন্য কোনো পুরুষ সহকারীর কাছে। কিন্তু স্বপ্না বোসের সঙ্গ অভিলাষী আগন্তুকের সংখ্যাও কম নয়। বারো মাস তিরিশ দিনের প্রসাধনসামগ্রীই হয়ত কিনতে আসে তারা। একের জায়গায় তিন গছিয়ে দেয় স্বপ্না বোস। কৃত্রিম বিপন্ন ভাবটি ফুটিয়ে তুলে তারা হয়ত বলে, বাঃ রে, এত কি হবে?

নিয়ে যান, বউ খুশি হবে।

বউ খুশি হোক না হোক, আর কেউ যে খুশি হবে সেটা জেনেই ওরা খুশি।

কাউকে বা স্বপ্না বোস ছদ্মকোপে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আপনারা না নিলে আমাদের দোকান চলে কি করে?

ওদের দোকান সচল রাখতে গিয়ে নিজে অচল হচ্ছে কিনা, সেটা তখনকার মত অন্তত অনেকেরই মনে থাকে না।

বাড়িগাড়িঅলা সুপরিচিতদের ছদ্ম-ত্রাস-জড়িত অন্তরঙ্গতার সুরও বৈচিত্র্যহীন নয়।–বাঃ রে, এলেই এককাঁড়ি জিনিস নিতে হবে তার কি মনে আছে? গরীব মানুষ, অত টাকা কোথায় পাব?

স্বপ্না বোস কখনো একঝলক হেসে ফস করে জবাব দেয়, তবে দোকানে আসেন। কেন? কখনো বা তেমনি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে, সত্যি কথাই তো, টাকার এত টানাটানি আপনার–আচ্ছা নিয়ে যান, জিনিসগুলো আমার নামে লিখিয়ে রাখবখন।

সানন্দে হার মেনে জিনিস নেয় তারা।

হল-এর এক প্রান্তে ভিজিটাদের জন্য দামী সোফা সেটি কৌচ পাতা। অন্তরঙ্গজনদের নিয়ে সেখানে দিব্বি আড্ডা জমে যায়। প্রায়ই চা আসে, সিগারেট আসে। ভাটনগরের সেদিকে একটুও কার্পণ্য নেই। সপ্রগল্ভ আড্ডার মাঝেই স্বপ্না বোস এক এক সময়ে সকলকে সচেতন করে দেয়। বেচারী ভাটনগর ভ্যাব-ড্যাব করে দেখছে দেখুন, আপনাদের ব্যাপার দেখে-হার্টফেল না করে বসে।

জোড়া জোড়া চোখ ছোটে অদূরে মালিকের দিকে। দুহাত তুলে ভাটনগর একটা হতাশার ভাব দেখায়। কখনো বা স্বপ্না বোসের দিকে চেয়ে হাসে মৃদু-মৃদু। আবেশ জড়ানো হাসি। আর এদিক থেকে সে হাসির নীরব প্রত্যুত্তরও বোধ করি সবারই চোখে পড়ে। বুকের ভেতরটা খচখচ করে ওটে অনেকেরই। কিন্তু ভাটনগরের কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব নয় কোনমতে, এও এতদিনে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবাঙ্গালী ভাটনগরের ভাগ্য দেখে তারা ঈর্ষা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেটা সরস হাস্য-কৌতুকের ব্যাপার।

স্বপ্না বোস শত্রুমুখে রসালাপের ছোট্ট বড়েটা এগিয়ে দেয় যেন। চাকরিটা আমার আপনারাই খাবেন দেখছি!

হাঁ-হাঁ করে ওঠে তারা।–নিশ্চয় খাবো, আলবৎ খাবো, কবে খাবো বলুন ভাটনগর চাকরি খেতে দেরি করছে বলেই তো আমাদের অমন খাওয়াটা মাটি!

বলে বটে। কিন্তু ভাটনগর সত্যিই যদি তার চাকরি খেয়ে এদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করে, বিউটি হাউস দুদিনেই তাহলে মরুভূমি হয়ে যাবে এও বোঝে।

খাওয়া তাদের একদিন জুটবেই, তবে ভাটনগরের গৃহস্বামিনী হলেও শুধুই ঘরের বউ হয়ে থেকে স্বপ্না বোস ব্যবসা মাটি করবে না, এটুকুই ভরসা।

অবকাশকালে ভাটনগরও সহাস্য বদনে এদের হালকা ফুর্তিতে যোগ দেয়। বিভিন্ন পেশার লোক আছে স্তাবকদলের গুঞ্জন-সভায়। ভাটনগর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলে, একবার স্টেথসকোপটা লাগান দেখি বুকে, ঠিক চলছে কিনা দেখি! কখনো বা নব্য ব্যারিস্টারের উদ্দেশে বলে, আপনি রেডি থাকুন স্যর, ওর এগেইনসট-এ হয়ত শীগগিরই কেইস ঠুকতে হবে! ওর মানে স্বপ্না বোসের। কখনো বা অসহায় মুখে প্রোফেসার নামখ্যাত লোকটির স্মরণ নেয়। কিসের প্রোফেসার, কোথাকার প্রোফেসার জানে না (জানে না বোধ হয় কেউ-ই), তবু বলে, আপনার কাছে আমি দর্শন পড়ব প্রোফেসার-এ জীবনে আর কি সুখ!

হাসাহাসি পড়ে যায়। স্বপ্না বোসের পাশের জায়গাটা আপনিই খালি হয়ে যায়! জায়গাটা কে ছেড়ে দিলে ভালো করে খেয়াল না করেই ওর গা-ঘেঁষে বসে পড়ে ভাটনগর। স্বপ্না বোস তাকায় আড়চোখে। সে কটাক্ষ-বাণে ভাটনগর কতটা বিদ্ধ হয় বলা শক্ত। কিন্তু আর যারা বসে, তাদের দৃষ্টিপথে সে কটাক্ষ একেবারে মর্মে গিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে থাকে। হাসি-বিদ্যুৎ-প্রেম–এ তিনের একখানি ঝকঝকে ছুরি যেন। চোখের দুকোণে একটু লালিমা, চোখের তারার তড়িত-ঝলক আর চোখের গভীরে কাজল-দীঘির নিবিড়তা। আঁখি-কোণের ওই লালিমা অবশ্য তারা যখন-তখন দেখে দেখে পাগল হয়। কিন্তু এই তিনের ট্রায়ো সব সময়ে বড় চোখে পড়ে না।

আর, এই দৃষ্টি-মাধুর্য দর্শন থেকেই হয়ত সকলে এরা মনে মনে উপলব্ধি করেছিল, ভাটনগরের কাছ থেকে স্বপ্না বোসকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা স্বপ্নের মতই ব্যর্থ হবে। কারণ মানুষটা তার এই বিচিত্র আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই এই নারীর প্রসন্নতার শতকরা সবটুকুই দখল করে বসে আছে।

তবু কিন্তু চেষ্টার কসুর হয়নি।

www.bengaliebook.com

চায়ের নেমন্তন্ন, সিনেমার আমন্ত্রণ, পিকনিক পার্টির আহ্বান–এমনি অনেক কিছুর সাদর এবং সাগ্রহ আকুতি সলজ্জ বিব্রত মুখে একের পর এক প্রত্যাখ্যাত করেছে। স্বপ্না বোস। খুব যে একটা জোরালো কারণ দেখাতে পেরেছে এমন নয়। পারেননি। বলে বিব্রত হয়েছে, লজ্জিত হয়েছে আরো বেশি। নিরুপায় হয়ে রূপ-রসিকের দল। যুগ্ম আহ্বান জানিয়েছে ওদের। ভাটনগর খুশিতে ডগমগ। পারলে তক্ষুনি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ছোটে। হাঁক-ডাক করে স্বপ্না বোসকে ডেকে সুসংবাদ শোনায়।

জবাবে আবার সেই কটাক্ষ-বাণ। ভ্রূকুটি করে স্বপ্না বোস শেষে এমন একটা কিছুর ওজর দেখায়, যাতে করে আমন্ত্রণকারীদের সামনেই ভাটনগরের সকল উৎসাহে যেন ঠাণ্ডা জল পড়ে একপ্রস্থ। বলে, অমুক জায়গার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে বসে আছ এরই মধ্যে?

বলে, মিস্টার আর মিসেস অ্যাডভানিকে কি কথা দিলে যে সেদিন?

বলে, সেদিন আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে বলে নাকে খত দিয়েছিলে?

অথবা কিছু না বলে একেবারে হতাশার দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই থাকে, যার অর্থ –এমন লোককে নিয়ে তো আর পারিনে!

ভাটনগরের তাতেই পূর্ব কোন প্রতিশ্রুতি বা তেমনি কিছু একটা মনে পড়ে যায়। মাথা চুলকে বিব্রত মুখে মাপ চায় আমন্ত্রণকারীদের কাছে।

এই কবছরে সকলেই সখেদে উপলব্ধি করেছে, বিউটি হাউসের এই তিন ঘন্টা ছাড়া স্বপ্না বোসের মনের আঙ্গিনায় আর পলকের ঠাঁই হবে না কারো। কিন্তু স্বপ্না বোস যাদু জানে। এই তিন ঘণ্টার সপ্রগল্ভ সান্নিধ্য-প্রাচুর্যের মোহও ভক্তজনেরা কাটিয়ে উঠতে পারে না শেষ পর্যন্ত। পারতে চায়ও না। কিন্তু এর পরে কোথায় থাকে স্বপ্না বোস, কোন জগতে তার গতিবিধি, তার অবকাশকালের কতটা দখল করে আছে ভাটনগর–এসব প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি কিছু। মিলেছে এক টুকরো হাসি, এক লাইন কাব্য বা একটু কিছু হেঁয়ালি। শেষ পর্যন্ত ভাটনগরের ভাগ্যের ওপর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে কৌতূহলে ক্ষান্ত দিয়েছে সকলেই।

বিউটি হাউসের আর এক বিপরীত আকর্ষণ ভূতনাথবাবু।

ভূতের যিনি নাথ তিনি আর যাই হোন, নিজে ভূত নন। কিন্তু এ ভূতনাথের নামের সার্থকতা ষোলকলায় পূর্ণ। হল এর একটা কোণের দিকে ছোট টেবিল পেতে বসে একমনে একের পর এক ক্যাশমেমো কাটে। টাকা লেনদেনের জন্য আলাদা ক্যাশ কাউন্টার আছে। যে যাই কিনুক, সেলসম্যান অথবা সেগার্লকে মাল নিয়ে আগে ওর টেবিলে ফেলতে হবে। এই তিন ঘণ্টায় মুখ তোলার অবকাশ থাকে না বেচারীর। তবু এরই মধ্যে ওকে নিয়ে প্রায়ই একটু-আধটু হাস্য-কৌতুকের প্রহসন ঘটে যায়।

মানুষটার চেহারার মধ্যে যেন বেপরোয়া কারুকার্য চালিয়ে গেছেন বিধাতা। গায়ের রঙ আবলুস কাঠকে হার মানায়। ছোট ছোট চোখ দুটোয় এতটুকু জীবনের সাড়া নেই- একেবারে নিরাসক্ত, নিষ্প্রাণ। নাকটা হঠাৎ যেন সামনের দিকে তুবড়ে গেছে। পুরু ঠোঁট, প্রকাণ্ড মাথা আর মাথাবোঝাই অবিন্যস্ত কোকড়ানো চুল। গায়ের রঙে চুলের রঙে মিশে গেছে। চোখধাঁধানো বিউটি হাউসের ঝকমকানি একাই যেন ব্যালান্স করেছে ভূতনাথ। ভাটনগরের রসজ্ঞানের তারিফ করে খদ্দের বন্ধুরা। সেলসম্যান, সের্গার্লরা একতরফাই হাসি-তামাসা করে ভূতনাথের সঙ্গে। একতরফা কারণ, ভূতনাথ কোন কথার জবাব দেয় না, মুখ তুলে মড়া-চোখে তাকায় একবার, মাথা নিচু করে মেমো কাটায় মন দেয় আবার।

ওর সঙ্গে স্বপ্না বোসের অন্তরঙ্গতাটুকু সব থেকে বেশি উপভোগ্য। এ অন্তরঙ্গতাও একতরফাই। অর্থাৎ স্বপ্না বোসের তরফ থেকে। ভূতনাথকে নিয়ে কেউ কিছু বললেই সে প্রতিবাদ জানায় তৎক্ষণাৎ বলে, রাহু ছাড়া চাঁদ মানায় না, ভূতনাথ ছাড়া বিউটি হাউস মানায় না। মেমো লেখাতে গিয়ে হাল্কা চাপল্যে তার মাথার ওই ঝাকড়া চুলের মুঠি ধরে দুই-একবার ঝাঁকুনি দেওয়াটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

কোন রসিক ভক্ত ঠাট্টা করে।–এও যেন রাহুর সঙ্গে চাঁদের মিতালি!

www.bengaliebook.com

মুচকি হেসে স্বপ্না বোস জবাব দেয়, একমাত্র রাহু ছাড়া চাঁদের কাছে আর ঠাই। কার?

মাঝে মাঝে আরো বেশ খানিকটা গড়ায়। এখানকার সর্বজনজ্ঞাত একটা বড় তামাসার কথা হল যে, ভূতনাথবাবু নাকি স্বপ্না বোসের প্রেমে পড়েছে। কার মাথায় যে প্রথম এই রসিকতাটুকু এসেছিল, সে আর কারো মনে নেই। কিন্তু কথাটা থেকে গেছে। কালোর সঙ্গে আলো মেশে না বলেই হয়ত এ ধরণের রসিকতা জমে ভালো। ভাটনগরও সানন্দে যোগ দেয় এসব হাসি-ঠাট্টায়।

স্বপ্না বোস হয়ত বলে, মিথ্যে ওকে দোষ দেওয়া কেন, আমিই বরং ওর প্রেমে পড়ে গেছি!

শোনামাত্র ভাটনগরকে সচেতন করে দিতে চায় কেউ, বলে, সাবধান ভাটনগরজী, ওই ভূত বাবাজীই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আপনার ঘাড় থেকে

মনোমত কথাটা আর হাতড়ে পায় না।

স্বপ্না বোস আলতো করে জুড়ে দেয়, পেত্নী ছাড়াবে!

সমস্বরে হেসে ওঠে সকলে। ভাটনগর একবার সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূরে কর্মরত মূর্তিটির দিকে। বলে, ভূতনাথ ইজ এ জুয়েল–এ ব্ল্যাক জুয়েল-রত্নের প্রতি আর লোভ না থাকে কোন মেয়ের!– তবু মুখে যে যত হাসি-তামাশাই করুক, একমাত্র ভাটনগর ছাড়া স্বপ্না বোসকে যখন-তখন তরল হাস্যে ওই ভূতনাথের গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে দেখে বা ঝাকড়া চুলের গোছায় বেপরোয়া চাপাকলি আঙুল চালাতে দেখে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে অনেকেরই।

রাত নটা বেজে গেছে।

বিউটি হাউসের গেট বন্ধ। কর্মচারী-কর্মচরিণীরা বিদায় নিয়েছে। কোমর-উঁচু ঝকঝকে কাঠঘেরা গণ্ডীর মধ্যে মালিকের নির্দিষ্ট গদি-আঁটা-আসনে বসে গভীর মনোযোগে হিসেব দেখছে ভাটনগর।

হল এর অন্য প্রান্তে নিজের জায়গায় বসে সেদিনের বিক্রির মেমো ওলটাচ্ছে ভূতনাথ। মাঝে এক-আধবার চোখ যাচ্ছে তার বিপরীত কোণের দিকে, যেখানে ক্রেতা অভ্যাগতদের জন্য সৌখীন সোফা-সেটি পাতা। কৌচের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে স্বপ্না বোস। শুধু এখন নয়, কাজের মধ্যেও আজ একাধিকবার নিবিষ্ট-চিত্ততায় ছেদ পড়েছে ভূতনাথবাবুর। ওই নারীমুখের হাস্যলাস্যের মাত্রাটা আজ বেড়েছিল, একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট ঘরে নিরিবিলি সান্নিধ্যে আজ দুবার দুটো লোকের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ ধরে, তাও লক্ষ্য করেছে। মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তোলে না বড়। কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু, ভূতনাথবাবু সব দেখে।

কৌচের ওপর স্থাণুর মত পড়ে আছে স্বপ্না বোস। শ্রান্ত, ক্লান্ত। প্রায় নির্জীব যেন। ভালো লাগছে না কিছুই ভালো লাগছে না। কান্নার মত একটা বিষাদের তরল স্রোত বইছে সর্বাঙ্গে। ভাবছে, কিছু ভাববে না, ভাবলেই তো ভাবনার বিভীষিকা বাড়ে। ভাবছেও না কিছু, তবু দুর্বোধ্য বোঝার মত কি যেন বুকে চেপে আছে।

অদ্‌ভুত নীরবতা বিউটি হাউসে। সবগুলো আলো জ্বলছে তেমনি। তেমনি ঝকঝক করছে শো-কেইসের দ্রব্যসম্ভার। কোথাও টু-শব্দটি নেই। শুধু তিন কোণে তিনটি প্রাণী। সামনের দরজা বন্ধ। পিছনের পথ দিয়ে বেরোয় তারা। প্রাসাদ-সৌধের পিছনদিকেও একাধিক নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। সেদিক দিয়ে বেরুলে বাড়ির মধ্যেই দশ দিকে দশ পথ।

ঠং করে ঘড়িতে শব্দ হল একটা। সাড়ে নটা বাজল। কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্বপ্না বোস। অলস মন্থর গতিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ভূতনাথবাবুর কাছে।

মুখ না তুলেই ভূতনাথ বলল, বোসো।

–হয়নি তোমার?

–হয়েছে। মেমো-বইয়ের ওপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে চোখে চোখ রাখল। তার। তেমনি মড়া-চোখ, ভাবলেশহীন, নির্বিকার। সে চোখে এতটুকু আগ্রহ নেই।

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল স্বপ্না বোস। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

–কিছু না,খুব ক্লান্ত?

–নাঃ, ভালো লাগছে না কিছু।

–লাগবে না তো!

–কেন? কণ্ঠস্বরে তিক্ততা প্রকাশ পায় আবার।

ভূতনাথ শান্ত কণ্ঠে বলল, এখন শুধু ভালো লাগছে না, আর কিছুদিন বাদে তিলে তিলে জ্বলতে হবে। জেনে-শুনে নিজে দুঃখ সৃষ্টি করলে দুঃখের শেষ কোথায়?

–থামো, থামো! অস্‌ফুটকণ্ঠে প্রায় গর্জে ওঠে স্বপ্না বোস। চাপা কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, খুব সাহস দেখি যে?

-হ্যা-ল-লো! ডোন্ট ফাইট মাই ডিয়ার!

শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল দুজনেই। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, পায়ের শব্দ শোনা যায় না। ভাটনগর কখন এসেছে দুজনের কেউ খেয়াল করেনি।

–সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ!

বসল দুজনেই।

www.bengaliebook.com

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ভাটনগর একটা শূন্য চেয়ারে এক পা তুলে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্বপ্না?

-ইয়েস স্যার!

— –তোমাকে কিছু বলবার আছে।

–ইয়েস স্যার…

ভাটনগর তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করল আবার একটু।-ইউ সিম টু ফরগেট ইওরসেলফ..অপরকে ভোলানো আর নিজে ভোলা এক কথা নয়…ডোন্ট রিসিভ ইনডিভিজুয়াল অ্যাটেনশান অ্যান্ড ইনভাইট ট্রাবলস…আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

শুষ্ককণ্ঠে স্বপ্না বোস জবাব দিল, ইয়েস স্যার…।

–গুড নাইট!

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভাটনগর। আর হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠেছে স্বপ্না বোসের দুই চোখ। সে অদৃশ্য হবার পরেও সেই দিকে চেয়ে নিঃশব্দে আগুন ছড়ালো আরো খানিকক্ষণ।

পরে মাথা রাখল ভূতনাথের টেবিলের ওপরেই।

চেয়ার ছেড়ে ভূতনাথ উঠে দাঁড়াল। এক দিকের কাঁচের আলমারি খুলে একটা আরকের শিশি বার করল। ড্রপারে করে সাদা জলের মত আরক তুলে নিল কয়েক ফোঁটা। কাছে এসে বলল, ওঠো রাত হয়েছে, এর পরে তো আরো কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই!

স্বপ্না বোস মাথা তুলল। কিছুটা সংযত, কিছুটা শান্ত। নিজেই দুহাতের আঙুলে করে একটা চোখের ওপর নিচ টেনে ধরে আলোর দিকে মুখ ফেরালো। ভূতনাথ ড্রপ ফেলল চোখে। একে একে দুই চোখেই।

নীরবে উঠে গেল স্বপ্না বোস। এক কোণের আড়াল থেকে একটা পেটমোটা ভারী চামড়ার হাতব্যাগ তুলে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ভূতনাথ বসে আছে। নীরব, নিস্পন্দ। যেন ঘুমিয়ে আছে। কোন তাড়া নেই। কোন চাঞ্চল্য নেই। সময় কেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ওই ব্যাগ হাতে নিয়েই আবার দেখা দিল যে নারী, তাকে চিনবে না বিউটি হাউসের অতি পরিচিত কোন খদ্দেরও।

ঘড়ির দিকে তাকালো ভূতনাথ। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। হবার কথা। রোজ ঘণ্টাতিনেক লাগে যে প্রসাধন সম্পূর্ণ হতে, সেটা তুলতে কম করে এক ঘণ্টা তো লাগবেই। এমনিতে ওঠে না, ওই হাতব্যাগে আছে নানা রকম রাসায়নিক নির্যাস– সেটা যথাস্থানে রেখে ভূতনাথের মুখোমুখি বসল আবার।

সদ্যস্নাতা। আটপৌরে বেশবাস। সর্বাঙ্গের চাপাহলুদ পেলবতা ধুয়ে-মুছে গেছে। শ্যামাঙ্গী। কুৎসিত। চোখের ড্রপে নেত্রকোণের সেই মন-মাতানো লালিমার আভা কেটে গেছে। দাঁতের নিখুঁত প্লাস্টার-পালিশ উঠেছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অধর-কোণের কামনা জাগানো তিলটাও।

অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট দুই চোখ মেলে স্বপ্না বোস তাকালো ভূতনাথের দিকে।

ভূতনাথও তাকেই দেখছিল।

তার সেই মড়া-চোখের দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। নিস্পৃহতার আবরণটুকুও সরে যাচ্ছে। কোমলতার আভাস আসছে যেন। চেয়েই আছে ভূতনাথ।

ভারী সহজ লাগছে তার বিধাতার গড়া ওই নারীমূর্তি।

কুৎসিতের মধ্যেও কোথায় যেন সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে সে।

তৃষ্ণা

www.bengaliebook.com

প্যাট মেনডোনসা, এই ঘরে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পারছি। আমি আর যুঝব না, বাধা দেব না, আমার ক্ষমতা ফুরিয়েছে–তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভয় হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাঁড়াও, তোমার কাকে ভয়?

ঘরে যে কটি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তারও। রোগের ঘোরে অনেকে অনেক রকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয়। জড়তা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সবরকমভাবে হার মেনে ক্লান্ত বিষণ্ন থমথমে গলায়। স্পষ্ট করে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। অনেকের কানে সেটা নিজের মৃত্যুঘোষণার মত লাগল।

অসুখের ঘোরে রোগী আগেও অনেকবার ভুল বকেছে, বিকারগ্রস্ত দুই চোখ টান করে অনেকবার ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর এমন স্পষ্ট হয়ে কানে লেগে থাকেনি কারো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হয়নি। তাতে নিজেকে আগলে রাখার ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইনজেকশন আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে তখন রোগীকে ঘুম পাড়িয়েছেন। আজ ছদিন ধরেই তাই করছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধের দেখছেন না। অথচ আরো দুজন সতীর্থ চিকিৎসকের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেও সঠিক রোগের হদিস পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এক-একবার ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দরকার। আবার মনে হয়েছে, এই অবনতির লক্ষণ গোটাগুটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দরুন। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে কোন রোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়। স্নায়ু সে-রকম বিকল হলে দেহের অন্যান্য লক্ষণও তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তিনি শুনেছেন রোগীর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এর ওপর বড় রকমের মানসিক বিপর্যয়ের যে কারণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি, সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তাও তার মাথায় আসেনি। সুপ্ত বাসনার একটা বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তিনি। যে রাতের কথা শুনেছেন সেই রাতে, ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকার রোমান্সসর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলে-ছোকরাদের

জানতে বাকি নেই তার। যে কারণেই হোক বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসিক চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জী। বন্ধুদের মধ্যে আরো দুই-একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনেছিল। আর সাতদিন আগে উৎসবের সেই রাত্রিশেষে একটা মজার প্রহসন তারা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছিল। কেউ কেউ অসংযত ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত করেছে নরিসকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি না? তোর মত হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো। কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমুগে যা।

ঠাট্টা যারা করেছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জীও তাদের একজন।

ফিলিপ নরিসের এই কণ্ঠস্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হল এই কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বারপ্রান্তে বুঝি সত্যই কোন রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জীর চোখ যেদিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আলনা। আলনার হ্যাঁঙ্গারে গরম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, বিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু। শোনা যায় না, কিন্তু চ্যাটার্জীর মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা…প্যাট মেনডোনসা…!

ঘরের-মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জী। এই ছদিনে অনেকবার যে কথা মনে হয়েছে, কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে। যখন দিয়েই ছিল, এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন ভুল হয়েছে। কি ভুল, কেন ভুল-

চ্যাটার্জীও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরিস, চ্যাটার্জী নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল–অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ওষুধ খাওয়ালেন, ইনজেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো এক কাজ করো, উৎসবের পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প্যাট মেনডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও– ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো-এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেনডোনসা হয়ত ডজন দুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাধিয়ে রেখেছে কে জানে–বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবেখন দেখে নিও। তোমরা যে ঠিকানায় গেলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে–সে তো। বেসামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে!

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে! তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধা লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না-হয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামত কাগজে বিজ্ঞাপন একটা দিয়েই দেখবে? পরমুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে না, ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কি করে? এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

যাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে সে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও প্রদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

.

এবরে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধ করি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ-সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্বভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান মেয়ে-পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ানদের মধ্যে আবার জাতের রেষারেষি আছে। গোড়া ব্রামিন-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ানদের মাথা উঁচু-সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ানদের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মত। এখানে। জাত-বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সংগতি! যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক! নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল-এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা! এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণত সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সবজান্তার আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে–এখানে তারই কদর বেশি। সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতিবিধি আচার-আচরণ সরল, সংযত–অথচ বন্ধুবান্ধবরা তার বেশির ভাগই বেপরোয়া, সদা মুখর। কারো টাকার দরকার হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপ নরিসের কাছে,

হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিয়ে দেবে। না থাকলে, আর টাকার প্রয়োজন যার সে প্রিয়পাত্র হলে, ধার করে এনে দেবে। দিয়ে অনুগ্রহ করবে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালো চাকরিই করে, ব্যাচিলর, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকার। সংগতি আছে।

তাহলেও ফিলিপ নরিস ক্লাবের প্রথম সারির কেউ নয়। অর্থাৎ চ্যাটার্জর মত নিজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সভ্য বা সভ্যারা ভালো করে চেনেও না তাকে। তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দরুন সভার আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয়। তার মত সাদামাটা সভ্যসংখ্যা শতকের ওপর। দুদশজনের কাছে যেটুকু খাতির সে পায়। তাও চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার দরুন। এইজন্যই চ্যাটার্জীর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে, চ্যাটার্জীর সক্রিয় সহযোগিতায় তার কাগজে নরিসের দুই-একটা আবেগমুখর প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। তিরিশ টাকা দক্ষিণ পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খরচ করে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীর ঋণ শোধ হয়েছে। ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই-একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ করে। চ্যাটার্জীরও ভালো লাগে ফিলিপ নরিসকে।

ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের রাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয় আলোয় একাকার। ছমাস আগে থেকেই এই একটা রাতের প্রতীক্ষা করে থাকে সকলে। এক রাতের উৎসবে কত হাজার টাকা খরচ হয় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। সভ্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদের গাড়ির ভিড়ে প্রাসাদসৌধের সামনের দুটো বড় বড় রাস্তার অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত রাতের উৎসব-খাওয়াদাওয়া নাচগানের ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়ের ঘটনা, বোম্বাই শহর তখন ড্রাই নয়, অতএব বহুরকম রঙিন পানীয়ের ব্যবস্থারও ত্রুটি ছিল না কিছু। রাত বারটার পরে ডান্স হলে যখন নাচের ডাক পড়ল, নিজের নিজের দুটো পায়ের ওপর তখন অনেকেরই খুব আস্থা নেই।

...সেই মেয়েটির দিকে আবার চোখ পড়ল ফিলিপ নরিসের। এই নিয়ে বারকয়েক চোখ গেল তার দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বয়স। এই উৎসবে এই বয়সের সঙ্গীহীন মেয়ে বড় দেখা যায় না। ডান্স হলের দরজার ওধারের দেয়াল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয়, কিন্তু ওই মেয়েটির মত একা কাউকে মনে হল না নরিসের। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড় শুকনো–এক ধরনের বিষণ্ন ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ-চাউনি। এই পরিবেশ মেয়েটির যেন পরিচিত নয় খুব–মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কর মত নাচ দেখছে এক-একবার, আবার শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিরিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে, বিশেষ করে এই সময়ে কারো দিকে কারো চোখ নেই। সকলেই যে যার সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। এই রাতের মত রাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকার কথা নয় ফিলিপ নরিসেরও। সে নাচতে একটু-আধটু জানে বটে, কিন্তু এগিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায়ই না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে, আর তাইতেই বেশ একটু আমেজের মত লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সহজাত সঙ্কোচে কারো দিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন।

মেয়েটির বিষণ্ন ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নরিসের মুখের ওপরেও আটকালো দুই একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেল না মুখ থেকে।

ফিলিপ নরিস উঠে মেয়েটির কাছে এলো একসময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখ-মুখ আরো নিষ্প্রভ বিষণ্ন মনে হল নরিসের। কেমন এক ধরনের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্‌ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না...আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নরিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন? মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নরিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল না, কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না…ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে…

হঠাৎ তুমি শুনে নরিস রীতিমত অবাক। অথচ মেয়েটি যে খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কি নাম?

নরিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট করে মনে করতে পারছে না। স্মরণের চেষ্টা। বেশি মাত্রায় মদদ খেয়েছে কিনা নরিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দরুনই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা…মার্টিন ডিসুজা…চেনো?

নরিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ন মুখখানা বড় অদ্ভুত লাগছে নরিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিসুজা, কি করে তাও স্মরণ করতে পারল। না। নরিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড় অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে, তার কাছে থেকেই হয়ত বা বড় রকমের কোনো আঘাত পেয়েছে।

নরিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ–বি চিয়ারফুল অ্যাণ্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

www.bengaliebook.com

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম-জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে যেন। দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নরিস ভেবে পেল না। তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিস্মরণের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছে।

মাথা নাড়ল– নাচবে।

ডান্স হল। তারা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ করে নরিসের মনে হয়েছে। মেয়েটি বড় দুর্বল, হয়ত অনেকটা পথ পার হয়ে নিজের অগোচরে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয় সুরে বলল, আগে কিছু খেয়ে নাও না, এই উৎসব সমস্ত রাত ধরে চলবে।

তার চোখের আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আরো একটু বদলেছে। নাচের ফাঁকে নরিসের মুখখানাই দেখছে ঘুরে ফিরে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেয়েটির তাকে পছন্দ হয়েছে। বোঝা যায়। মাথা নেড়ে জানালো খাবার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

নরিস...ফিলিপ নরিস। তোমার?

প্যাট মেনডোনসা।...তুমি খুব ভালো...ডিসুজার মতই দরদী...তুমি কি ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিয়ান?

নরিস হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝল না।–না, কেন বলো তো?

নয় শুনে প্যাট মেনডোনসার চোখে-মুখে খুশ্রি আভাস। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, আমার কেমন শীত-শীত করছে।

নরিস কি করতে পারে! আধঘণ্টার আলাপে মেয়েটির প্রতি মায়া অনুভব করছে। কেন জানে না। আর কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পারে। এ যেন এরই মধ্যে তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু কাছে। টেনে আনল, নাচের গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গী এত সয় বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছে ঘেঁষে এসেছে, মন্থর পায়ে নাচছে, আর প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামের জন্য দুজনে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল একটু। আর তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্‌ফুট ক্লান্ত সুরে বলল, আমার ভয়ানক শীত করছে। আমি আর থাকতে পারছি না…

জামার ওপর তার কাঁধে হাত রেখে নরিস বিচলিত হল একটু। গাটা সত্যি বড় বেশি ঠাণ্ডা! আবার আগের মতই শ্রান্ত আর ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নরিস নিজের দামী গরম কোটটা নিয়ে এসে তার গায়ে পরিয়ে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আর রাত না করে তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাও- বাড়ি কোথায়?

বান্দ্রা…।

বেশি দূরে নয় তাহলে। প্যাট মেনডোনসার গায়ে তার নিজের কোটের পকেট হাতড়ে এক টুকড়ো কাগজ আর কলম বার করল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তার দিকেই বাড়িয়ে দিল।–তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিয়ে আমি কোটটা নিয়ে আসবখন।

এ-রকম বিদায়টা যেন খুব পছন্দ নয় মেয়েটির, মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নাম, বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নরিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনের লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখ পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল।-ও-দিকটা কি?

বাথ…

অস্‌ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নরিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নরিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নরিস। বলে কি! এ কার পাল্লায় পড়ল সে! তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, না না, কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়ছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মত শোনালো। নরিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙঘাতিক মেয়ে! ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই–নাকি এও মানসিক রোগ কিছু! বিস্ময় সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকালো নরিস, বলল, আঃ, কেউ এসে পড়লে কি ভাববে! বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে– চেয়েই আছে। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নরিসের।...ভালয় ভালয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়!

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আর একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই–অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেরোয়নি। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নরিস পায়চারি করছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নরিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায় মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে–কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আর নরিসের ভয়

বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে–ভিতরে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল!

ঘড়ি দেখল! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে একঘন্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে! বিমূঢ় নরিস কি করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কঁপল শুধু।

নরিস দৌড়লো হঠাৎ। আধভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বার করল। চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাতপায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এলো নরিস। চ্যাটার্জীর পিছু পিছু আর দুই-একজন উৎসুক বন্ধুও এলো। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিসে ফোন করল। পুলিস এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

একসঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নরিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই-একজন ঠাট্টা করল, নরিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখী হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে! নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোন পথ নেই!

কেয়ারটেকার বা পুলিসের লোকেরও ধারণা হল, নরিস বেসামাল হয়েছিল হয়ত, ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি–আর বাইরে থেকে দরজার হ্যাঁণ্ডেল টানাহেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানাহেঁচড়া করে বা কোনরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা–এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে গবেষণা করার মত ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নরিসকে একদিকে টেনে এনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, রাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নরিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না। বলল, অভ্যেস নেই–ওটুকুতেই গণ্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নরিস, এই দ্যাখো, আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে, নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সংগত মন্তব্যই করল সে। বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে- তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার, তাই

নরিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে কার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নরিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়ত কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে–তাই কোনরকম বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টাতিনেক নরিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নরিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে।

ঘুম তাড়িয়ে নরিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে। দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের

নম্বর মিলিয়ে বান্দার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নরিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

নরিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গত রাতের ফাংশানে শাত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল নরিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভার। বললেন, আচ্ছা আপনারা বসুন একটু

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো, এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কিনা।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট-দশটি নারীপুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নরিস। বলল, ইনি–

দু চোখ টান করে বৃদ্ধ নরিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নরিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দুবছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নরিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মত আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা–মাটিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে।

কিন্তু ডিসুজার বাপ-মার বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিয়ান–বিয়ে হতে দিলে না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই হয়ত বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে–দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল–তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাল নরিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধিক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোট সমাধি একটা– সমাধির ওপর ক্রস। ক্রs-এ ঝুলছে নরিসের সেই কোট। সমাধির গায়ে নামের হরপ–প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সমাধির সামনে হুশ নেই।

নরিস ফুল দিল। ক্রস-এর ওপর থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো–

ফিলিপ নরিসের হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছিল চ্যাটার্জী। কিন্তু বলা হয়নি, ওটা থাক।

দুজনার ঘর

তৃতীয় মানুষ এলে দুজনার ঘর টেকে না।

অনেক, অনেক মূল্য দিয়ে তবে এই সার জেনেছে কাজললতা।

.

বিস্ময়ের তাড়নায় তার ভয় উবে যাবার দাখিল। অনেকক্ষণ সঙ্গোপনে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে। জমজমাট মনে হয়েছে দোকানটা। জলুস বেড়েছে,

লোকজন বেড়েছে, খদ্দের বেড়েছে। দেখছিল আর বুকের তলায় কাটা-ছেঁড়ার ওপর যেন এক ধরনের খুশির প্রলেপ পড়ছিল।

কিন্তু নিভৃতের রোমাঞ্চ মিলিয়ে আসতে চোখের নজর বাড়ছিল। কাজললতার খটকা লাগছে কেমন। অত দূর থেকে ভালো ঠাওর করতে পারছে না। যদিও ওখানকার। ভিতরের আলো দিনের আলোর মত সাদা। তবু কি যেন এক ব্যতিক্রম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একটাও চেনা মুখ চোখে পড়ছে না। পায়ে পায়ে এগোলো আরো একটু। জনা দুই অল্প বয়সের ছেলে কাজ করছে, আর তিনটি মেয়ে। আঠেরো থেকে বাইশ চব্বিশের মধ্যে হবে মেয়েগুলোর বয়েস। কাজললতা আরো একটু এগিয়ে তাদের দেখছে ভালো করে। চোখের দৃষ্টিটা খরখরে হয়ে উঠছে। এ আবার কি? এ কি দেখছে। কাজললতা?

নিজের জীবন-যাত্রা যেমনই হোক, সকল সংশয়ের উর্ধ্বের কোনো উগ্র শুচিশুদ্ধ মানুষকে জীবনের জটিল রাস্তায় চলতে দেখলে মন হঠাৎ যেমন ধাক্কা খায়, ওই মেয়েগুলোকে দেখে প্রায় তেমনিই একটা ধাক্কা খেয়ে উঠল, কাজললতা।

নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে আরো একটু এগলো সে।

সুন্দর দূরে থাক, তেমন সুশ্রীও নয় একটা মেয়েও। তবে সাজগোজে শ্রী বাড়াবার চটক আছে। যে চটকে শ্রী আসলে নিষ্প্রভ হয়, কিন্তু চোখ টানে। পরনে উগ্র রঙের শাড়ি, গায়ে গলা ঘেঁষা টেপ ব্লাউস, হাতে এক এক বোঝা রঙবেরঙের কাঁচের চুড়ি, গালে ঠোঁটে রঙ।

এই বৈচিত্র্যের বুদ্ধি একদিন কাজললতাই দিয়েছিল। জীবিকার্জনের সেই যুগ্ম আসরে সে-ই প্রথম এবং একমাত্র নায়িকা ছিল। কিন্তু এ আবার কি? লোকটা কি এতদিনে তাহলে এই জটিল যুগে তাল ঠকে চলার সহজ রাস্তাটা চিনে ফেলেছে? কাজললতা যখন ওই আসরের নায়িকা ছিল, তখনো হয়ত লক্ষ্যের তফাৎ ছিল না খুব। কিন্তু এ যেন রাতের নিভৃতে প্রত্যাশার তাগিদে ঘরের স্ত্রীর কাছে আসা আর গণিকালয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু তফাৎ, অনেকটা সেই রকম। রুচির তফাৎ, শালীনতার তফাৎ।

নিজের অজ্ঞাতে আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কাজললতা। প্রায় দোকানের সামনেই।

তারপর দ্বিতীয় ধাক্কা। ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ওধারের ক্যাশবাক্সের সামনে মালিকের নির্দিষ্ট আসনটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে সম্পূর্ণ একজন অচেনা লোক।...বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বয়স, রোগা, ঢ্যাঙা, পরিপাটি সাজ। উঠছে, তদারক করছে, আবার গিয়ে বসছে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে নজর রাখছে, ক্যাশবাক্সে টাকা তুলছে।

দোকানের প্রায় দরজায় দাঁড়িয়েই নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকে দেখছে কাজললতা। মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন। সচকিত হয়ে খানিকটা পিছনে সরে এলো। মাথা উঁচিয়ে দুচোখ টান করে সাইনবোর্ডটা দেখল আবার।

দুজনার ঘর। সেই সাইনবোর্ড। লাল রক্তের অক্ষরে সেই লেখা। দুদিকে সেই দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি। সেই ঘর।

কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? আবার এগিয়ে একেবারে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। আবার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ করে মালিকের আসনের সেই লোকটাকে।

দুজনার ঘর জমজমাট বটে। যেমন তারা আশা করেছিল একদিন, প্রায় তেমনি। সে আর রাধাকান্ত। কাজললতা, আর রাধাকান্ত দুজনার ঘরের ওই বাইরের দিকটা বহুলোকের সমাবেশের প্রত্যাশাতেই খোলা ছিল। না, দুজনার ঘর বলতে সত্যিই দুজনের বাসের ঘর এটা নয়। কোনো কাব্যের ব্যাপারও নয়। এটা একটা সাইনবোর্ড। ওই সাইনবোর্ডে বড় বড় জ্বলজ্বলে রক্তের হরগে ওই কথাকটি লেখা। লেখার দুপাশে নিপুণ রঙের প্রলেপে একটি পুরুষমূর্তি আর একটি রমণীমূর্তি, আঁকা। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে। এই চাওনিটুকু বড় জীবন্ত।

দুজনার ঘর বলতে দুজনার ঘর গড়ার উপকরণ যোগানোর দোকান এটা। বিজ্ঞাপনের চটকে বস্তুজগতে ভাগ্য বদলের অনেক বিস্ময়কর নজির আছে। কখন কোন্টা যে জনতার মনে দাগ কেটে বসবে বা চোখে ঘোর লাগাবে, তার স্থিরতা কিছু নেই। দাগ পড়ল কি ঘোর লাগল, অমনি কপাল ফিরল।

দুজনার ঘরের এখন অন্তত সেই কপাল। দলে দলে মেয়ে পুরুষ আসছে, জিনিস কিনছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো বয়সের স্বামী-স্ত্রী অথবা যুগ্ম দয়িতা এই পথে। চললে ওই সাইনবোর্ডটা তাদের চোখ টানবে। পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা মুখ টিপে হাসবে। কিছু কেনার থাকলে তারা এই দোকানেই ঢুকে পড়বে।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর নিজের অগোচরে একটু একটু করে কাছে এসে এসেও এই দৃশ্যই দেখছিল কাজললতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু সত্যিই এ কি দেখছে সে? মালিকের আসনে ওই লোকটা কেন? চোখে। পলক পড়ে না কাজললতার। দোকান-ঘেঁষা ফুটপাথে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে আছে, কত লোক যে তাকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছে হুশ নেই। লক্ষ্য দোকানের মালিকও করল এক সময়। ভিতরের ভিড় কমেছে, তাই দেখছে। তারপর অনেকবারই চোখ গেল সেদিকে। উঠে এলো এক সময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিছু নেবেন? ভিতরে আসুন না–

কাজললতা থতমত খেল একপ্রস্থ। তারপর লোকটাকে আবার দেখল একটু। ভিতরে এসে দাঁড়াল সে। মহিলাটির হাবভাব দেখে দোকানের মালিক নন্দ ঘোষ বিস্মিত। উৎসাহিত হবার মত খদ্দের নয় কিছু, আটপৌরে বেশবাস, মোটসোটা গড়ন, কপালে নয়া পয়সার থেকে বড় জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। দেখলেই বোঝা যায় তেমন অবস্থাপন্ন নয়, তেমন আধুনিকা তো নয়ই। তবু তার ঈষৎ-বিমূঢ় চাউনির মধ্যে কি যেন ছিল যা নন্দ ঘোষের খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি।

জিজ্ঞাসা করল, কি চাই বলুন?

কাজললতা আত্মস্থ হল এবার। কিছু বলতে হবে। অস্ফুটস্বরে বলল, মালিককে…

নন্দ ঘোষ এ রকম চাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না খুব।–আমিই মালিক, বলুন কি বলবেন?

তার মুখের ওপর কাজললতার চাওনিটা বদলাতে লাগল আবার। শূন্য দৃষ্টি লোকটার মুখের ওপর ঘুরল বারকয়েক। কি বলবে বা কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবে কিনা ভেবে পেল না।

আর নন্দ ঘোষের মনে হল, যা বলতে চায় এই অপরিচিতা, তা বোধহয় এত লোকজনের সামনে বলতে পারছে না। এখন ভিড় আরো পাতলা হওয়ায় ওই ছোঁড়া ছুঁড়িগুলো এদিকেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। এই অজ্ঞাত রমণীর প্রতি তার একটু কৌতূহল হল কেন কে জানে?…কিছু বলতে চায় নিশ্চয়, নইলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ও-ভাবে অতক্ষণ ধরে দোকানের দিকে চেয়ে ছিল কেন? আর ভিতরে এসেই বা। মালিকের খোঁজ করল কেন?

আচ্ছা, এদিকে আসুন

মালিকের আসনের পিছনে ছোট একটা খুপরি ঘর। এটা নিজস্ব বিশ্রামের ঘর নন্দ ঘোষের। সেখানেই নিয়ে এলো কাজললতাকে। তাকে বসতে বলল, তারপর। আবার জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

কি বলবে কাজললতা? এ পর্যন্ত আসবে তা তো ভেবে আসেনি। একবারে ভিতরে ঢুকবে তা তো কল্পনাও করেনি। এই আসা, এই বসা, সব নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। কিন্তু জবাব কিছু দিতে হবে। লোকটা চেয়ে আছে। সে-ই নাকি মালিক এই দুজনার ঘরের। তার ব্যবহারেই হয়ত লোকটার চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে কেমন!

জবাব মাথায় এলো চকিতে। উদ্ভট কিছু নয়, নিতান্ত প্রয়োজনের জবাব। বাস্তব জবাব। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদগত অনুভূতি দমন করে নিতে হল আগে। এই পরিবেশ, এখানকার বাতাসই হঠাৎ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে ধরতে চাইল তাকে। ....এই চেষ্টাই আগে করবে বই কি কাজললতা। দরকারও তো। ...যদি হয়, তারপর সবই জানতে পারবে।

নন্দ ঘোষের মুখের ওপর তার ডাগর দুই চোখ আটকালেন্সবার। বলল, একটা চাকরির জন্য এসেছিলাম।...খুব দরকার। দেবেন?

না, এবারে আর নন্দ ঘোষ খুব বিস্মিত হয়নি। এই রকমই কিছু যেন মনে হয়েছিল তার। শোনামাত্র তার ঘাড় নাড়ার কথা। এযাবৎ আগে দুপাঁচটা মেয়ে তার কাছে চাকরির জন্য এসেছে। তাদের হাবভাব অবশ্য এরকম ছিল না। তারা এসেছে, সবিনয়ে চেষ্টা করেছে, তারপর চলে গেছে।

কিন্তু এর বেলায় নন্দ ঘোষ কেন যে মাথা নাড়তে পারল না তক্ষুণি জানে না। রমণীটির প্রতি গোড়াতেই তার চোখ পড়েছিল কেন, মুখের দিকে চেয়ে সেটাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা করল। সামনের চেয়ারটায় বসল এতক্ষণে। পকেট থেকে সস্তাদামের সিগারেট বার করে ধরালো। ব্যবসায়ীর তির্যক দৃষ্টি।

কাজললতা প্রতীক্ষা করবে। ব্যগ্র প্রত্যাশা। লোকটার একটা হাঁ বা নার ওপর যেন জীবনমরণ নির্ভর। এই ব্যাকুলতাই যে তার স্বপক্ষে কাজ করছে জানে না। শোনার অপেক্ষায় ফর্সা মুখ ঘেমে উঠেছে তার।

নন্দ ঘোষ ভাবছে যেন। ভাবছে ঠিকই, আর আড়ে আড়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে কেন চোখে পড়েছিল তার! ...ওই অতবড় জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপটার জন্যই বোধহয়। মুখখানা বড়সড়, চওড়া, আর বেশ ফর্সা–তাই বোধহয় মানিয়েছে ভালো। তাকালেই দু চোখ আগে ওই সিঁদুরের ধাক্কা খায়।

–থাকা হয় কোথায়? আপনি তুমি বর্জন করে একটা নির্লিপ্ত প্রশ্ন নিক্ষেপ করল নন্দ ঘোষ।

এই কাছেই। ...বস্তিবাড়ির একখানা ঘরে।

আর কে আছে?

কাজললতাকে চেষ্টা করতে হয়নি, মুখ দিয়ে আপনিই নির্‌গত হয়েছে।

–মা।

খুব মিথ্যে বলেনি কাজললতা, সাত দিনের চেনা ওই বুড়ী যদি মা না হয় তো মা আর কে?

স্বামী কোথায়? কি করে?

প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে নিচ্ছে নন্দ ঘোষ। সম্মুখবর্তিনীর সচকিত বিবর্ণ মূর্তিটা তাই ভালো করে চোখে পড়েও পড়ল না নিলে কেমন হয় তাই ভাবছে সে। বৈচিত্র্যের দিকটা ভাবছে।...যে মেয়েগুলো আছে দোকানে, তারা অতি আধুনিকা। ওই কেমন হাওয়া আজকাল, নইলে তাকালে তো গা রি-রি করে নন্দ ঘোষের। কিন্তু খদ্দের। তো কত রকমেরই আছে, অনেকের হয়ত তারই মত গা রি-রি করে। সে-স্থলে এই বৈচিত্র্য দেখলে হয়ত চোখ জুড়োবে। মুখশ্রী বেশ কমনীয়, মিষ্টি, তার ওপর ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ চোখ টানেই। তার যখন টেনেছে, কত খদ্দেরের টানবে ঠিক কি! গেরস্থঘরের মেয়ে-পুরুষদের ভালো যে লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। আসল কথা, অতি আধুনিকা আর সিঁদুরপরা গেরস্থঘরের বউ–দু-রকমই কাজ করছে দোকানে–এই বৈচিত্র্যটাই বড় বলে মনে হতে লাগল নন্দ ঘোষের।

তার প্রশ্নের জবাবে বিড়বিড় করে কি বলল, নন্দ ঘোষের ঠিক যেন কানে ঢুকল না। মুখভাব একটু অন্যরকম দেখছে কেন, তাও বুঝল না। আবার জিজ্ঞাসা করল, স্বামী এখানে থাকে না?

কাজললতার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে আবার। মাথা নাড়ল– থাকে না।

নন্দ ঘোষের খটকা লাগল কেমন। স্বামীর কথায় মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বরাবরই এখানে থাকেন?

এবারও মাথা নাড়ল কাজললতা–অর্থাৎ এখানে থাকত না। কিন্তু মুখ বুজে থাকলে হবে না জানে। ঢোক গিলে মৃদু জবাব দিল, পাকিস্তানে থাকতুম, অদিন হল এসেছি।

অস্বস্তি…মিথ্যে বলার অস্বস্তি। কিন্তু খুব মিথ্যে নয় বোধহয়। পাকিস্তান বর্ডরেই তো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। আর কদিন থাকলে কি হত কে জানে!..অদিন হল এসেছে, তাও সত্যি।

নন্দ ঘোষ যেটুকু বুঝবার নিজের মত করে বুঝে নিল। যে জায়গা থেকে আসছে। বলল তাতেই যেন সব বোঝা হয়ে গেছে। সর্বস্ব খুইয়ে এ-রকম তো কতই আসছে। বুক বেঁধে যত বড় করেই সিঁদুরের টিপ পরুক, সত্যিকারের আশাভরসা যে কতটুকু তা এই মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নাম কি?

কাজল…

মুখের ওপর লোকটার যাচাইয়ের দৃষ্টি এই যেন প্রথম অনুভব করল কাজললতা। সম্পূর্ণ নাম আর বলা হল না।

সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ এখানে, রবিবারে শুধু ছুটি–সুবিধে হবে?

কাজললতা তক্ষুনি মাথা নাড়ল, হবে। আরো বেশি সময় থাকতে হলেও আপত্তি ছিল না। থাকতে না পারাটাই যেন যাতনা।

মাইনে কত চাই?

যা দেবেন।

আশায় আনন্দে দুচোখ চকচক করছে কাজললতার। মাইনের কথা সে একবারও ভাবেনি। দুজনার ঘরে তার জায়গা হবে কি হবে না, সেটাই একমাত্র ভাবনা।

www.bengaliebook.com

হবে মনে হয়...।

হল। পরদিন থেকেই তাকে আসতে বলে দিল নন্দ ঘোষ। তারও মনে মনে হিসেব কষা শেষ হয়েছে। চার-চারটে মেয়ে সে দোকানে রাখতে পারবে না। আগামী সপ্তাহে মাস শেষ হলে ওই কেতকী মেয়েটাকে বিদায় করবে। যেমন চেহারা তেমনি মুখের ওপর কটকট করে কথা বলে। কালই ছাড়িয়ে দেবে তাকে।

কাজললতা বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নড়তে চায় না। বিকেলে যখন আসে, ভাগ্যের এই যোগাযোগ কল্পনাও করেনি। দূর থেকে খুব সঙ্গোপনে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে বলে এসেছিল। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল কেমন। কাজললতা যেন এখনো নিঃসংশয় নয়, একটু আগের ওই অধ্যায়টা সত্যি কিনা। যা দেখেছে আর দেখে এলো, তাই ঠিক কিনা!

এ কার বদলে কাকে দেখল সে? দুজনার ঘরের আসল মালিক গেল কোথায়?

.

..দুটি জিনিসের সুনাম আর দুর্নাম ছিল রাধাকান্তর। তার মগজে বুদ্ধি ছিল আর স্নায়ুতে রাগ ছিল।

কিন্তু এ দুটি জিনিসের সহঅবস্থান রীতি নয়। একের প্রকোপে অন্যটিকে নিষ্প্রভ। মনে হত। মাথা যখন খেলত, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তখন কারো বড় দোষও চোখে পড়ত না। আবার স্নায়ু যখন চড়ত তখন মনগড়া ত্রুটি আবিষ্কার করে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠতেও দেরি হত না।

কিন্তু অবস্থার ফেরে স্নায়ুর উপর যত হাত পড়েছে মগজের উপর ততো নয়। স্টুডিওতে চাকরি করত। সিনসিনারি আঁকার কাজ। সে আর বটুক একসঙ্গেই কাজে কেছিল। ঠিক একসঙ্গে নয়– বটুক কদিন আগে ঢুকে তাকে ঢুকিয়েছিল। বটুকের মুখ ভালো চলে। গুছিয়ে কর্তাদের মনের মত ব্যবস্থাপত্র করা, সাজ-সরঞ্জাম জোগানো –এসব ব্যাপারে তার মাথা ভালো খেলত। কিছুকাল চাকরি করার পর কাঁচা টাকা রোজগারের পথটাও ভালই

www.bengaliebook.com

চিনেছিল। গণ্ডায় গণ্ডায় দশ টাকা রেটের এক্সট্রা আর্টিস্ট জুগিয়ে মাথা পিছু দুতিন টাকা বখরা আদায় করাটা আদৌ গর্হিত কাজ ভাবত না টুক! তাছাড়া পার্টির বিশ্বাসভাজন হয়ে খুচরো কেনা-কাটার ফাঁক দিয়েও মন্দ রোগার হত না তার। রোজগার যেমন করত, ওড়াতও তেমনি।

মনে মনে ওই লোকটাকেই রাধাকান্তর থেকে অনেক বেশি চৌকস ভাবত কাজললতা। বহু ব্যাপারে যোগ্য ভাবত। কিন্তু মনে মনে সে ভয়ই করত রাধাকান্তকে। এমন চণ্ডাল রাগ আর বুঝি দেখেনি। কত জায়গায় চাকরি করেছে ঠিক নেই। ওই মেজাজ নিয়ে কোথাও টিকে থাকে নি। স্‌টুডিওর চাকরিও কতবার যায়-যায় হয়েছিল, ঠিক নেই; প্রতিবারই ওই বটুকই বাঁচিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষটা পুরাপুরি রাধকান্তই ধরে নিয়েছিল কাজললতা। পয়সাওলা মালিকের যদি স্বভাবচরিত্রের বালাই না থাকে তো তার কি? আর ঈষং মত্ত অবস্থায় রাধাকান্তর আঁকা সিন অপছন্‌দ হওয়ার ফলে ঘরের বউকে টেনে একটা নিম্নস্তরের রসিকতা করে ফেলেই থাকে যদি তো সেইজন্য গায়ে ওরকম ফোস্কা পড়তে গেল কেন? আর রাগ হয়েছে বলে কি একেবারে মালিকের গলা টিপে ধরতে হবে?

কি হয়েছিল না হয়েছিল, বটুকের মুখে সবই শুনেছিল কাজললতা।

রাগ তো বলতে গেলে বিয়ের পর থেকে তারও।

কোন সাধ-আহ্লাদ মিটেছে তার? ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই। অথচ কতরকম স্বপ্নই না, ছিল বিয়ের আগে। যে ঘরের মেয়ে কাজললতা, বিয়ের আগে তার রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল বলা চলে পাঁচজনের কাছে। ওর মত সুন্দরী গোটা ব্যারাকের মধ্যে আর একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। তার বাবা ছিল পুলিশ ব্যারাকের বাজার-সরকার। তাই স্বামীর থেকেও বটুকের কাজটা অনেক বেশি পছন্দ হত তার। তাছাড়া বটুক তার শিক্ষাদীক্ষার কদরও করতে জানত। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল কাজললতা। সেটা ওদের পরিবারে কম কথা নয়। এই লেখাপড়া আর এই চেহারা দেখেই পড়ন্ত মানীবংশের ছেলে হয়েও তাকে মনের আনন্দে

নিজের ঘরে। নিয়ে গিয়ে তুলেছিল রাধাকান্ত। কিন্তু দুদিন না যেতে রূপের কদর, শিক্ষার কদর সব যেন ঘষা পয়সা।

তার উপর উঠতে বসতে শাসন। কাজললতার একটু সাজতেগুজতে ভাল লাগে, বিকেলে একটু রাস্তায় এসে দাঁড়াতে ভালো লাগে, আর সিনেমা দেখতে আর সিনেমার গল্প শুনতে কত যে ভালো লাগে তার ঠিক নেই। এই জন্যেই কি লোকটা কম। গঞ্জনা দিয়েছে তাকে?

এটে উঠতে পারে না শুধু বটুকের সঙ্গে। দুজনার ঝগড়া হয়, রাগারাগি হয়। কিন্তু বটুকের স্বভাব উল্টো বলে আবার ভাবও হয়। তাছাড়া উপকার তো কম করে না, ভাব না করে যাবে কোথায়? বটুক যখন সিনেমার গল্প করে বা কখনো জোর করে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও লোকটা বাধা দিতে পারে না।

চাকরি যাবার পর দিনে দিনে মেজাজের উন্নতি হতে লাগল রাধাকান্তর। মুখের দিকে তাকাতে ভয় করত কাজললতার। এদিকে দিন চলে না এমন অবস্থা। সেই দুঃসময়ে বটুক একটা মস্ত লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল কাজললতাকে। দিন পিছু দশটাকা হারে ছবিতে মুখ দেখাতে আপত্তি কি কাজললতার? কোথাও একটু কাঁদতে হবে, কোথাও একটু হাসতে হবে–কোথাও বা কিছুই করতে হবে না। সপ্রতিভভাবে একটু কাজ করতে পারলে উন্নতিও অবধারিত। দশটাকাটা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশেও গিয়ে ঠেকতে পারে একদিন...বটুকেরই হাত, সে অনায়াসেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

রাধাকান্‌ত বাড়ি ছিল না। কাজললতা তার জন্য অপেক্ষা করছিল আর বাতাসে সাঁতার কাটছিল। তারপর রাধাকান্ত বাড়ি আসতেই বটুকের প্রস্তাবটা, আরো পবিত করে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

রাধাকান্তর বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল ঠিকই। সেই মুখের দিকে আর সেই চোখের দিকে চেয়ে কাজললতা সভয়ে পায়ে পায়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে কাঠ সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বটুকের একদিনের গল্প মনে পড়ে গেল তার। কবে নাকি এক পরিচিত জ্যোতিষ

দুই বন্ধুর হাত দেখে রাধাকান্তকে বলেছিল, রাগ-টাগগুলো সামলাও একটু, কবে না খুন করে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হয়!

..হঠাৎ মনে হল, সেই বীভৎস খুন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে লোকটার চোখে-মুখে। সেই কটা ত্রাসের মুহূর্ত কাজললতা ভুলবে না বোধহয়।

এর পরেই দিন ফেরাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল রাধাকান্ত। দেশে কিছু জমিজমা ছিল, চেষ্টাচরিত্র করে তাই বিক্রি করে এলো। হাসিমুখতার হাতে সাড়ে তিন হাজার টাকা। কাজললতার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা।

রাধাকান্তর মন স্থির। চাকরি আর নয়, গোলামী আর নয়। বরাতজোরে ভালো ঘর পেল একটা। অবশ্য তার জন্য সেলামী গুনতে হল হাজার টাকার ওপর। তারপর দিনকতক নাওয়া-খাওয়া ভুলে নিজের হাতে সাইনবোর্ড না করতে বসল। দোকানের নাম শুনে তখন হেসে বাঁচেনি কাজললতা, দুজনার ঘর–মাথায় আসেও!

সেই সাইনবোর্ড শেষ হতে চোখে পলক পড়ে না কাজললতার। মাঝখানে বড় বড় লাল আগুনের হরপে দোকানের নাম–আর দুমাথায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে একজন মেয়ে আর একজন পুরুষ। মুচকি হেসে রাধাকান্ত মেয়েটাকে দেখিয়ে বলেছিল, তোমার মুখের আদল এনে দিলাম।

শোনার পর কাজললতার মনে হচ্ছিল সেই রকমই যেন। খুশিতে আনন্দে তাগিদ দিয়েছিল, ওই লোকটার মুখও বদলাও। রাধাকান্ত বলেছে, দোকানে কেউ ঢুকবে না তাহলে!

দোকান হয়েছে। স্টেশনারি আর ছোটখাট হোসিয়ারী মিলিয়ে একসঙ্গে দোকান। এই সঙ্গে নৈমিত্তিক ঘরকন্নার সামগ্রীও কিছু রেখেছে। দোকান করতে বসে রাধাকান্তর নেশা চেপে গেল যেন। কম করে আরো হাজার দেড়েক টাকা চাই চাই-ই। এবার স্ত্রীকেই পরামর্শ দিল, টাকাটা বটুকের কাছ থেকে ধার পাবার চেষ্টা করতে। নিজে চাইলে দেবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু

কাজললতা চাইলে নিরাশ করবে না হয়ত। যেমন করে হোক যোগাড় করে দেবে।

দিল। ধার করেই এনে দিন নাকি। বলা মাত্র এত টাকা ধার পায় যে, তার ওপর কাজললতার একটু শ্রদ্ধা বাড়াও স্বাভাবিক। দোকান চলতে লাগল। কাজললতাও যখন দোকানে কাজ করার প্রস্তাব দিল, রাধাকান্তর খুশি ধরে না। লোক তাহলে আর একজনের বেশি রাখতেই হবে না–আর স্বামী-স্ত্রী দুজনে দোকান চালাচ্ছে, এই বৈচিত্র্য যে লোক টানবে তাতে তার একটুও সন্দেহ ছিল না।

ছটা মাস এই এক নেশার মধ্যেই কেটে গেল। কিন্তু টাকায় টান পড়ছেই। দোকানের টাকা ভেঙেই খেতে হচ্ছে। দোকান বড় করতে হলে আরো টাকা চাই। ওদিকে বটুকের কাছ থেকে আর টাকাপয়সা দূরের কথা, আভাসে ইঙ্গিতে আগের টাকাই ফেরত চাইছে সে। যার কাছ থেকে টাকা এনে দিয়েছিল সে তাগিদ দিচ্ছে।

ইদানীং বটুককে একটু খাতির করেই চলছে রাধাকান্ত। কাজললতাও। লোকটা উপকার তো কম করে না। ফঁক পেলে দোকানে এসে দাঁড়ায়, সাহায্য করে। সেই লোক টাকার কথা বলতে রাধাকান্ত বিপদ গনল। আবারও স্ত্রীকেই পরামর্শ দিল, ওকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে।

বোঝাতে গিয়ে তাকে চোখই রাঙাল কাজললতা, এখন টাকা চাইছেন মানে! টাকা দেব কোত্থেকে? উল্টে আরো টাকার যোগাড় দেখুন। বটুক হেসেছে একগাল। বলেছে, তুমি বললে তাও পারি না এমন নয়!

এদিকে দোকান করার নেশা কাজললতার অন্তত কমে আসছিল একটু একটু করে। আর সেটা যে ঠাট্টা-ঠিসারায় কমিয়ে আনছিল বটুকই, সেটা তখন অন্তত মনে হয়নি। এই দোকান করার ফাঁকে লোকটা আপন মনের মত আরো অনেক কাছে এসে গেছে। রাধাকান্ত মাল সংগ্রহের কাজে বেরোয়, দোকান চালায় তখন বটুক আর কাজললতা। বটুক নিজের কাজ কামাই করে প্রায়ই! তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসি-আনন্দের মধ্যে দোকান চালাতে ভালই লাগে কাজললতার। ফাঁক পেলে বটুক সিনেমার মজার

মজার গল্প শোনায় তাকে। বিশেষ করে আর্টিস্টদের গল্প। কাঁচা নোট কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানে, সেই গল্প। একস্ট্রা আর্টিস্টকে ইচ্ছে করলেই সে নাকি এখন দিন পিছু দশ টাকার জায়গায় কুড়ি টাকাও পাইয়ে দিতে পারে।

শুনে কাজললতার বুকের ভিতরে দোলা লাগে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

এদিকে রাধাকান্তর ওপর টাকার চাপটা শিথিল করল না সে। অপর দিকে সমর বুঝে কাজললতাকে জানিয়ে রাখল, অবুঝ লোকটাকে বশে আনার জন্যেই তার এই কারসাজি। চাপে পড়ে কাজললতাকে একটু স্বাধীন হতে দিলে সে-ই কাড়ি কাড়ি টাক এনে দিতে পারে। স্বাধীন হতে দিলে! কথাটা কোথায় গিয়ে যে স্পর্শ করেছিল, কাজললতা জানে না। তার মনে হতে লাগল, বিয়ের পর থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে সে এক অবুঝ শাসনের শিকলে বাঁধা।

সেই থেকে মন্ত্রণা শুরু। বটুক আরো বেশি করে ধার শোধের চাপ দিলেও তার আপত্তি নেই। তাকে স্বাধীন হতে দিলে টাকা রোজগার করে সে তো এই দোকানেই ঢালবে–দোকান ফাঁপিয়ে তুলবে। তাছাড়া যে স্বাধীনতার স্বপ্ন সে দেখছে, তার কাছে। এই দোকানও একটা পিঞ্জরের মত।

তার এই স্বপ্নের ঘোরে কতখানি এগিয়ে এসেছিল বটুক, কাজললতা দেখেও দেখতে চায়নি। তার হাতে কাঁধে হাত রাখলে কাজললতার মুখ লাল হয়েছে। বটুক অমনি টিপ্পনী কেটেছে, থাক, আর ছবিতে নেমে কাজ নেই!

তারপর সেই একদিন…।

শনিবার। দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে। রাধাকান্ত দেশে গিয়েছিল যদি আর কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পারে। দেশে তখনো তার দখলে মজা পুকুর ছিল একটা। সেদিন ফিরতেও পারে, না-ও পারে। ফেরে যদি অনেক রাতে ফিরবে।

কিন্তু আসলে রাধাকান্ত যে কোথাও যায়নি, সেটা এরা কেউ জানত না। যথাসময়ে দোকানের লোহার দরজা টেনে দেওয়া হয়েছে। কালো ভারী ক্যানভাসের পরদাটাও। দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি দুটো টুলে মুখোমুখি বসে তন্ময় হয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। কেমন। করে ঘরের অবুঝ লোকটাকে বোঝানো যায়? কি কৌশলে কাজললতা এটুকু স্বাধীনতা আদায় করতে পারে? তার একটা হাত বটুকের হাতের মুঠোয়। সন্ধ্যা কখন পেরিয়ে গেছে খেয়াল নেই।

কখন লোহার গেট সরেছে, কখন পুরু ভারী পরদাটা নড়েছে তারা টেরও পায়নি। পাবে কি করে, উঁচু কাউন্টারের ওধারে ওদিক ফিরে দুটো নিচু টুলে বসে দুজনে।

..তবু ষষ্ঠ চেতনা বলে আছে কিছু বোধহয়।

কাজললতা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে একসময়।

পরক্ষণে ভয়ে বিবর্ণ পাণ্ডুর একেবারে। দুজনেই। কাউন্টারের ওধারে রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কাজললতা কি দেখেছিল সেই চোখে? আর সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়েছিল তার?

মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ পশুর শেষ অব্যক্ত যাতনা আর অব্যক্ত হিংসা যেন গলে গলে পড়তে দেখেছে ওই দুটো চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে সেই জ্যোতিষীর কথা-খুন করে ফাঁসীকাঠে ঝোলার কথা।

কেমন করে দোকান থেকে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কাজললতা জানে না। আর কি করবে এখন, তাও জানে না।

চমকে ফিরল।…বটুক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে।

তারপর…

হ্যাঁ, তারপর দূরে অনেক দূরে পালিয়ে আসার পর, পরপুরুষের লোলুপ হিংস্র বীভৎসতা, আর নির্দয় নগ্ন অত্যাচারই দেখেছে সে। গা-ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার বুঝিয়ে বটুক পাকিস্তান বর্ডারে এনে ফেলেছিল তাকে। সময় আর সুযোগ বুঝে তাদের ফেরার কথা।

কিন্তু ফিরেছিল কাজললতা একাই। খুব সঙ্গোপনে। বটুকের চোখে ধূলো দিয়ে। ...বটুকের নেশা কেটেছে। কুৎসিতদর্শন লুঙ্গিপরা লোকের সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ করতে দেখেছিল তাকে কাজললতা। তার মতলব বুঝেছিল। সেই দিনই পালিয়েছিল।

সাত দিন হয় কলকাতায় ফিরেছে। তাকে আশ্রয় দিয়েছে প্রায় অন্ধ এক বুড়ী। ট্রেনে যোগাযোগ তার সঙ্গে। সে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, কলকাতায় কোনো বাড়িতে কাজ জুটিয়ে দেবে একটা। বুড়ীর কোথাও কেউ নেই তেমন–বোনপোর কাছে এসেছিল। কলকাতায় দুতিনটে বস্তি-ঘর ভাড়া খাটায় সে।

কলকাতায় এসে কাজললতা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ কপালে পরতে শুরু করেছে। শুধু পুরুষের কবল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে, তাদের কৌতূহলের তাড়না থেকে নিজেকে বাঁচানোর দায়ে। কপালের এই জ্বলজ্বলে সিঁদুর একটা জোরালো নিষেধের কাজ করছে শুধু। সত্যমিথ্যেয় বুড়ীমাকে কি বুঝিয়েছে সে ভালো মনে নেই। কপালে অমন টকটকে সিঁদুর দেখে সে বলেছিল, আহা, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, বেঁচে থাক মা। এই সিঁদুরের টানেই মরদটা একদিন ফিরে আসবে দেখিস।

দিনে দিনে খুশি উপচে উঠছে নন্দ ঘোষের। সে যে এমন একজনকে দোকানে। লাগিয়েছে, ভাবতেও পারেনি। দোকানটাকে নিজের বলে ভাবতে পারে বটে মেয়েটা। সকালে সকলের আগে এসে নিজের হাতে ঝটপাট দেয়, তারপর খুঁটিনাটি যাবতীয় কিছু ঝেড়ে মুছে তকতকে করে তোলে।

অন্য মেয়েদের কারো গাফিলতি দেখলে সত্যি সত্যি রেগে যায়, বকাবকিও করে। কাউকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও যেন তার চোখ টাটায়।

চারটে মাস না যেতে দোকানের আসল মালিক যে কে, এই ভুল হবার দাখিল অন্য কর্মচারী আর কর্মচারীণীদের। তাছাড়া নন্দ ঘোষকে সে পরামর্শও দেয়, এই করুন, এইসব জিনিস দোকানে এনে রাখুন। নন্দ ঘোষ তার প্ল্যান কাজ করে। দেখেছে, লাভ বই লোকসান হচ্ছে না। দোকানের এতটুকু ভালোর জন্যে এত উদবেগ। আর এমন উদ্দীপনা দেখে নন্দ ঘোষ যথার্থ অবাক হয়েছে এক এক সময়। পরীক্ষা করার জন্য ক্যাশের ভারও ছেড়ে দিয়ে দেখেছে এক-একদিন। দিয়েছে বটে, কিন্তু চোখ ঠিকই রয়েছে। একটা নয়াপয়সাও গরমিল হয়নি। নিজের জিনিস নিজের চুরি করার যেমন কথা ওঠে না, এ যেন তেমনি। ওদিকে খদ্দেরও বাড়ছেই।

তিন মাসের মধ্যেই নন্দ ঘোষের ভালো লাগতে শুরু করেছে। এই ভালো লাগাটা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কাজললতা তা ভালো করেই টের পেল। কিন্তু কিছু যায় আসে না যেন। কাজললতা শুধু এই দোকানটাকেই বড় করে তুলতে চায় আর সব কিছু ভুলতে চায়। দিনকে-দিন এই শুধু এক নেশার মত পেয়ে বসছে তাকে। লোকটা দুর্বল হলে যদি তার কর্তৃত্ব বাড়ে, আর আরো বেশি নিজের বলে ভাবতে পারে দোকানাটাকে–তার একটুও আপত্তি নেই। দোকান বড় করে তুলে কাজললতা যেন অদৃশ্য কারো ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে আর প্রায়শ্চিত্ত করছে।...আর পরপুরুষকে প্রশ্রয় দেওয়া? এখনো কপালের সিঁদুর তেমন করে লোকটাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি বটে, কিন্তু পর বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি এখনো?

কাজললতা শুধু দোকানটাকে আকাশছোঁয়া বড় করে তুলতে চায়, আর কিছুই চায় না। একটু প্রশ্রয় না পেলে লোকটা সে সুযোগ দেবেই বা কেন তাকে? এক একসময় চমকে ওঠে কাজললতা, তার কি মাথাখারাপ হল? নইলে মালিকের আসনের ওই লোকটাকেসুষ্ঠু সময় সময় রাধাকান্ত বলে ভাবতে চেষ্টা করে কেন? কেন ভাবতে ইচ্ছে করে, যা ঘটে গেছে তার সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়?

ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে নন্দ ঘোষ। দোকানের উন্নতি প্রসঙ্গে আলোচনার হলে, দোকানের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপের ছলে। এই আলাপ চলে দোকানে যখন আর তৃতীয় কেউ থাকে না, তখন। দোকান বন্ধ হবার পরেও দোকান নিয়ে মাথা ঘামায় দুজনে বসে।

নন্দ ঘোষের মাথা গরম হতে থাকে, হৃৎপিণ্ড লাফালাফি করতে থাকে, চোখের দৃষ্টি বদলাতে থাকে।

সেদিন শুক্রবার। একটা মেয়ের চাকরি চলে গেল। ঠারেঠোরে মেয়েগুলো প্রায়ই হাসাহাসি করত। সেই মেয়েটা সেদিন মুখে মুখে তর্কই করল কাজলল তার সঙ্গে। বলল, তুমি দোকানের কে যে কথায় কথায় চোখ রাঙাও?

কে সেটা তক্ষুনি তাকে বুঝিয়ে দিল নন্দ ঘোষ। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদায় করল তাকে।

পরদিন শনিবার।

তিনটেয় দোকান বন্ধ। বন্ধ হল। কাজললতা আর নন্দ ঘোষ ছাড়া আর সকলে চলে গেল। লোহার গেট প্রায় সবটাই টেনে দেওয়া হল, ভারী কালো পর্দা পড়ল।

একটু বাদে নন্দ ঘোষ বেরিয়ে খাবার নিয়ে এলো দুজনের জন্য। প্রতি শনিবারে দোকান বন্ধ হলে কম করে ঘণ্টা দুই ধরে দোকানের জিনিসপত্র নতুন করে সাজায় কাজললতা, গোছগাছ করে। নন্দ ঘোষ ততক্ষণ অপেক্ষা করে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। তারপর একসঙ্গে খায় দুজনে বসে।

খাওয়া শেষ হল। কাউন্টারের ওধারে ছোট টুলে মুখোমুখি বসে একসঙ্গে গোটাপাঁচেক সমস্যার ফিরিস্তি দিল কাজললতা। নিজেই আবার সমাধানের রাস্তা খুঁজতে লাগল। কারণ নন্দ ঘোষ বেশির ভাগই চুপ। চেয়ে আছে। দৃষ্টিটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

কাজললতার হঠাৎ খেয়াল হল, তার একখানা হাত লোকটার হাতের মুঠোয় চলে গেছে কখন। ওদিকে সন্ধ্যাও কখন পার হয়ে গেছে।

কাজললতার দুচোখ তার মুখের ওপর থমকালো।

তুমি অত বড় সিঁদুরের টিপ পরো কেন? অস্বস্তি বোধ করে বলেই বোধহয় কথা কটা বেরুল নন্দ ঘোষের মুখ দিয়ে।

কাজললতা জিজ্ঞাসা করল, ছোট করতে হবে?

নল ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে আছে শুধু। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। করলে খদ্দেরদের কাছে দোকানের বৈচিত্র্য নষ্ট হবে কিনা ভেবে পেল না।

চেয়ে আছে কাজললতাও।

সচকিত হয়ে হঠাৎ বিষম চমকে উঠল দুজনেই। কাউন্টারের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে কে।

কে- কাজললতা চিনল না। একটি বউ...কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে। কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? এরকম আর কবে দেখেছিল?

..মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ পশুর সেই শেষ অব্যক্ত যাতনা আর সেই অব্যক্ত ক্রুর হিংসা যেন গলে গলে পড়ছে। এই দুই চোখেও। ঠিক যেমন দেখেছিল রাধাকান্তর চোখে।

বিমূঢ় মুখে নন্দ ঘোষের দিকে ফিরতেই কাজললতা বুঝতে পেরেছে ছেলে কোলে বউটি কে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক পাথর যেন কাজললতা।

সামলে নিয়ে নন্দ ঘোষ রূঢ় কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল প্রায়, তুমি এখানে। কেন? ও-যাও বলছি, এখুনি যাও এখান থেকে!

কেলের ছেলেটা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। বউটির দুই চোখের গলিত ঘৃণা একটা কাপটা মারল নন্দ ঘোষের মুখের ওপর। তারপর সেই অব্যক্ত

যাতনায় কাজললতার সর্বাঙ্গ আর একবার ঝলসে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেল সে।

নন্দ ঘোষ শুকনো গলায় জোর এনে আস্ফালন করল, বাড়ি গিয়ে আমি দেখাচ্ছি। ওকে মজা! নিশ্চয় চাকরি গেছে বলে দোকানের ওই নচ্ছার মেয়েটা গিয়ে লাগিয়েছে!

কাজললতা কাঠ।

.

পরদিন থেকে কেউ আর তাকে দেখেনি। আবারও সার জেনেছে কাজললতা, তৃতীয় মানুষ এলে দুজনার ঘর টেঁকে না।

বিবেচনা সাপেক্ষ

পড়া শেষ হতে সকলেই ওরা চুপচাপ বসে রইল খানিক। শ্রোতাদের মধ্যে দুজন বেশ নামী সাহিত্যিক। বাদবাকি সকলে মোটামুটি নামী। গল্পটা নিয়ে মনে মনে সকলেরই একটু বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে ভেবে আমি মনে মনে খুশি।

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে নামী দুজনের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তা তোমার ইচ্ছেটা কি, নতুন লেখকের এই গল্প ছাপতে চাও?

আমি মাথা নাড়লাম, সেই রকমই ইচ্ছে বটে।

একটু ভেবে তিনি মন্তব্যসহ আবার প্রশ্ন করলেন, মাথা খাঁটিয়ে মোটামুটি মন্দ দাঁড় করায়নি, কিন্তু তোমার অতবড় কাগজে ছাপার মত স্পার্ক কিছু দেখছ কি?

আমি সায় দিলুম, খুব অবাক করার বা মুগ্ধ করার মত কিছু দেখছি না বটে। নতুন লেখকের গল্প নিয়ে সঠিক আলোচনা এরপর গড়গড়িয়ে বিস্তৃত হতে থাকল।

মোটামুটি নামীদের একজন বলল, লেখকের ভাষা বেশ সহজ তরতরে সেটা ঠিক, এজন্যেই আপনার ভালো লেগেছে বোধহয়। কিন্তু গল্পটাতে ভাবের চাপা বাঁধুনি কম, তাছাড়া ঠিক ছোট গল্পের ছকে এটাকে ফেলা যায় না–অনেকটা রিপোর্টিংয়ের মত লাগছে।

প্রতিবাদের সুরে আর একজন সমর্থনই করল তাকে। বলল, নতুন লেখকের কাছে তুমি তার বেশি আশা করো কি করে?

হাসিমুখে তৃতীয় তরুণ শ্রোতা গল্পটার বুকে অনায়াসে একটা ধারালো ছুরি চালিয়ে দেবার মত করে মন্তব্য করল, কিন্তু আগাগোড়াই উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডা ধরনের না? গল্পের রসের উপর দিয়ে উদ্দেশ্যটা এ রকম সাদাসাপটাভাবে উপচে উঠবে কেন?

আসরের দুনম্বর নামী সাহিত্যিক মুখ খুললেন এবারে, মাথা নেড়ে বললেন, সেদিক থেকে গল্পটা তো মার খেয়েইছে, তা ছাড়াও অনেক জায়গায় একটু আনরিয়েল হয়েছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়া বিভাবতীর জবাব আর বিচারুকের চাপা উচ্ছ্বাসের দিকটাই ভাবো না–অবাস্তব মনে হয় না?

আমি দ্বিধান্বিত মুখে জবাব দিলাম, কিন্তু লেখক তো বলছে গল্পটা সত্যি ঘটনার ছায়া নিয়ে লেখা।

মোটামুটি নামীদের একজন সপ্রতিভ মুখে বলে উঠল, সত্যের থেকে ছায়াটা যে একটু বেশিই বড় হয়ে গেছে!

সকলে হাসল একপ্রস্থ।

একনম্বর নামী লেখক এবারে দুনম্বর নামী লেখকের সমালোচনার ওপর মন্তব্য চাপালেন।-আনরিয়েলই যদি বলো তো সব থেকে বেশি অস্বাভাবিক ব্যাপার মেয়ে বিয়ের রাতে মহিলাটির তার স্বামীকে ওভাবে মোটরে চাপিয়ে ব্যাণ্ডেলে চালান করা।

ওরকম ভ্যাবলাকান্ত স্বামী গল্প-উপন্যাসেই যা দুচারটে দেখা যায়।

মোটামুটিদের একজন সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল বারকয়েক–আমি ঠিক এই পয়েন্টটাই বলতে যাচ্ছিলাম দাদা, বিভাবতীকে সধবা রাখার দরকার কি? বিধবা করে দিলেই তো ওদিকের প্রবলেম মিটে যায়।

গল্পের সধবাকে কলমের খোঁচায় অনায়াসে বিধবা করে দেওয়া যেতে পারে, আর তাতে মেয়ে-বিয়ের রাতে ভ্যাবলাকান্ত স্বামীকে হারানোর সমস্যাও মেটে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। গল্পের মুখ রক্ষার খাতিরে এটুকু সংস্কার গহিত কেউ বলবে না। গল্প লিখতে বসে নিজেই কত সময় কুমারী মেয়েকেই বিধবা করেছি আর বিধবাকে শেষ পর্যন্ত কুমারী করে দিয়েছি ঠিক নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে চুপ করেই রইলাম।

নতুন লেখকের গল্পের প্রৌঢ়া নায়িকা বিভাবতীর নাটকীয় আচরণ, জাঁদরেলপনা, কথাবার্তা, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদির অবাস্তবতা নিয়ে অনেকভাবে খুঁতখুঁত করার পরে সাহিত্যিকরা আসর ভঙ্গ করল এক সময়। নামী সাহিত্যিক দুজন পরামর্শ দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকের ওপর সুনজর যখন পড়েছে, তোমার কলম চালিয়ে ঠিকঠাক করে নাও-এ-রকম তো কতই করেছ।

আমি বললাম, দেখা যাক, ছাপতেই হবে এমন কথা নেই–তবে তোমরাও আর একটু ভেবো তো।

তারা চলে যাবার পর নিজেই আবার কেন যে নতুন করে ভাবতে বসলাম, জানি না।

.সাদাসিধেভাবে বললে গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

বিভাবতী একজন জাঁদরেল মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে। বয়সকালে চেহারা বেশ ভালো ছিল বোঝা যায়। এখনো দিব্বি শক্ত-সমর্থ, মজবুত স্বাস্থ্য। বে সরকারী স্কুলের হেডমাস্টারের বউ। হেডমাস্টার বলতে নব্যযুগের হেডমাস্টার নন শৈলেশ চাটুজ্জে, নব্যযুগে পা দিয়ে টাকার মুখ দেখতে না দেখতে চাকরির মেয়াদ ফুরিয়েছে। মাস পাঁচেক হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অন্য মাস্টাররা পাঁচ জায়গায় ছেলে পড়িয়ে তার

থেকে বেশি রোজগার করত, কিন্তু হেডমাস্টারের পদমর্যাদা লাভ করে তিনি তাও পারতেন না। এখন অবশ্য সে বাধা নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটাই বাধা। হার্টের ব্যারাম, একটু পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় করে। বিভাবতী তা করতে দেন না। ধরা-করা করলে চাকরির মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়ানো যেত হয়ত, কিন্তু স্ত্রীর আপত্তির দরুন সে-চেষ্টা করেন নি।

এ-বাড়িতে এই স্ত্রটির আপত্তি আর মতামত একটা বিশেষ ব্যাপার। ছেলে মেয়েরা আড়ালে মন্তব্য করে, হেডমাস্টারি আসলে চিরকাল তাদের মা-ই করে আসছে।

অতিশয়োক্তি নয়। বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে সকলেই কর্তার দাপটে তটস্থ। সংসারের কোনো ব্যাপারে অপোজিশন বলে কিছু নেই-সেখানে বিভাবতীই সব।

তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েরা বড়, ছেলে এ বছরই হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বড় মেয়ে দুটো স্কুল ফাইন্যাল পাস করে বসে ছিল। চেহারা তাদের মোটামুটি সুশ্রী। নাম রমা আর শ্যামা। গত দেড় বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। খুব সামান্য ভাবেই হয়েছে। তবু ঘরে সোনাদানা যা একটু ছিল, আর সামান্য সঞ্চয় যা ছিল, সব নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। তাতেও কুলোয় নি, প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের তহবিল কিছুটা হালকা করতে হয়েছে। তবু স্ত্রী-টি কড়া-ক্রান্তি হিসেব করে চলেন বলেই দেড় বছরের মধ্যে দুটো মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, শৈলেশ চাটুজ্জে সেটা একবাক্যে স্বীকার করেন। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে খরচের কথা ভেবে গায়ে জ্বর এসেছিল তাঁর, কিন্তু স্ত্রীর ধমক খেয়ে সে জ্বর ছেড়েছে আর বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে।

বড় মেয়ে রমার বিয়ে দিয়েছেন ব্যাণ্ডেলে এক স্কুল মাস্টারের কাছে। ওই মেয়ের সংসারে আরো কয়েকটি পোষ্য আছে। তাই সদা অনটন। সে তুলনায় বর্ধমানে মেজ মেয়ে শ্যামার একটু ভালো বিয়ে হয়েছে। নিজেদের পৈতৃক ঘর-বাড়ি ওই জামাইয়ের, তার ওপর ছেলেটা মোক্তারি করে মন্দ পয়সা পায় না। বড় মেয়ে অনটনের মধ্যে আছে বলে মনে মনে বিভাবতীর

তার ওপরেই টান বেশি একটু। যে কোন ছল ছুতোয় তাকে একটু সাহায্য করতে পারলে খুশি হন।

তৃতীয় মেয়ে শম্পা আগামী বছরে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এই মেয়েটার ভালোয় ভালোয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে দায় চোকে ভাবেন বিভাবতী। ছেলে কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, কবে বিয়ে করবে, সে ভাবনা ভাবেন না তিনি। ভিতরে ভিতরে চিন্তা তাঁর এই মেয়েটাকে নিয়েই শম্পাকে নিয়ে।

তার প্রথম কারণ, তিন মেয়ের মধ্যে শম্পাই রীতিমত সুন্দরী। যেমন ফর্সা, তেমনি লম্বা-টম্বা-স্বাস্থ্যও সব বোনের থেকে ওরই ভালো। এই মেয়ে কলেজে যায় সেটাই তাঁর মনঃপূত নয় খুব। কিন্তু ঘরে বসিয়ে রেখেই বা কি করবেন। হায়ার সেকেণ্ডারি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার ফলে আর সেই সঙ্গে মেয়ের কদিন কান্নাকাটির ফলে কলেজে পড়ার অনুমতি দিতে হয়েছে। পার্ট ওয়ানও ভালোই পাস করেছে, সামনের বার পার্ট টু দেবে। বিভাবতীর ধারণা তাদের যা সঙ্গতি, মেয়ে বি. এ. পাস করলে তার বিয়ে দেওয়া আরো শক্ত হবে।

দুশ্চিন্তার দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটার স্বভাব। অন্য দুবোনের মত একটুও নয়। হেসেখেলে ধিঙ্গিপনা করে বেড়াতে ভালো লাগে, পরিপাটি করে সাজতে-গুজতে ভালবাসে, মুখে কথার খই ফোটে, সিনেমা দেখার নামে জিভে জল আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে মায়ের কাছে শম্পা যত দাবড়ানি খায় তেমন আর কেউ নয়। একটু বে-চাল দেখলে ওর চুলের গোছা টেনে ধরার জন্য এখনো মায়ের হাত নিশপিশ করে। আর ওর দিকে তাকালেই যেন বে-চাল দেখেন তিনি। মাকে যমের মত ভয় করে অবশ্য, কিন্তু চুপিচুপি মায়ের অমতের কাজও দুই-একটা শুধু ও-ই করে বসে। এত সাহস আর কারো নেই। এই সেদিনও ফিরতে দেরী হবে বলে কলেজ থেকে কোন দুই বান্ধবীর সঙ্গে চুপি চুপি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরেছিল। ছটা বেজে যেতেই মায়ের মনে ঠিক খটকা লেগেছে, ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন,–কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ঘাবড়ে গিয়ে মেয়ে অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল। মুখের দিকে চেয়ে সরাসরি মিথ্যে বলবে এত সাহস নেই। অতবড় মেয়েকে বিভাবতী পাখার বাঁট দিয়ে শুধু ঠেঙাতে বাকি রেখেছিল। মেয়ে কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে তবে রেহাই পেয়েছে। তবু না বলে সিনেমা যাবার সাহস হল কি করে তাই ভেবেই তাজ্জব বিভাবতী।

এই মেয়েটার জন্য এমনি নানা কারণে সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তার। মায়ের মেজাজ ভালো থাকলে শম্পা নিজেই কত সময় শোনায়, মায়ের সদাই সৎমায়ের মত ব্যবহার তার সঙ্গে! সে যেন নিজের মেয়ে নয়! খুব মিথ্যে বলে না। বাড়ির খাটাখাটনি সব থেকে বেশি তাকেই করতে হবে–দিদিদের বিয়ের আগেও এই পক্ষপাতিত্ব ছিল। পূজোর সময় এখনো সব মেয়েদের শাড়ি দেওয়া হয়। সব থেকে ভালো শাড়ি আর জামা বড় দুই মেয়ের কাছে যাবে–ছোট মেয়ের একটা হলেই হল।

আর সেই সাদামাটা শাড়ি পরে শম্পা যখন বেরোয় আর কলেজে যায়, সে দিকে চেয়ে বিভাবতীর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে কেমন–ওর শাড়ি জামা সব থেকে সুন্দর ঠেকে তার চোখে। ভাবেন আরো সাদাসিধে কিছু আনলেই যেন ভালো হত।

তিন মেয়ে এক ছেলে, কিন্তু ছেলের দলে আর একজনকেও ফেলা যায়। তিনি বাড়ির কর্তা শৈলেশ চাটুজ্জে। বিয়ে করে বিভাবতীকে ঘরে এনেছেন পঁচিশ বছর বয়সে। বড় জোর গোড়ায় পাঁচটা বছর বাদ দিলে তিরিশ থেকে আটান্ন-এই আটাশ বছর একটানা স্ত্রীর শাসনে প্রতিপালিত হয়েছেন তিনি। সেই শাসনও প্রয়োজনে কঠিন আর প্রয়োজনে কোমল। বয়স যত বেড়েছে ভদ্রলোক ততো বেশি স্ত্রীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ফলে স্ত্রীটিও তাকে বয়স্ক ছেলের মতই নেড়েচেড়ে লালনপালন করে এই বয়স পর্যন্ত টেনে তুলেছেন। স্বামীর হার্টের রোগ আবিষ্কার হওয়ার পর। থেকে তো স্ত্রীর নির্দেশে তার জোরে কথা বলাও বন্ধ। তার খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা। চলাফেরা সবই বিভাবতীর হিসেবমত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে ছিলেন বিভাবতী। তার বাপের সংসার সেদিনে অসচ্ছল ছিল না। আর পড়েছিলেনও সচ্ছল ঘরেই। স্বামী বিদ্বান, বাড়িতে বিদ্বান শ্বশুর বিদ্যমান। সদাগরী অফিসে ভালো চাকরি করতেন। বউ তার চোখের মণি ছিল। কি যে আনন্দে কেটেছে সেই দিন, ভাবলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে বিভাবতীর। সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। পান্তা খেতেও নুনে কুলোয় না এখন এমন অবস্থা। সামাজিকতা নেই, আদর আপ্যায়ন নেই, বাড়িতে দুটো অতিথি এলে চক্ষু স্থির হয় সকলের। শ্বশুর খেতে– ভালবাসতেন, খাওয়াতে ভালবাসতেন। আর কোন বিলাসিতা ছিল না তার। কেবল আনো আর পরিতৃপ্তি করে খাও সকলে। সেই সস্তাগণ্ডার বাজারে বাড়িতে যেন নিত্য নেমন্তন্ন লেগেছিল।

আর তারই দুদুটো নাতনীর কি ভাবে বিয়ে হল! মনে পড়লে রাগে দুঃখে চোখে জলই আসে বিভাবতীর। দুবারই সরকারী বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন। বরযাত্রীদের শুধু আদরযত্ন করে খাওয়ানো হয়েছে, অন্য সকলের বরাতে জলযোগ। অথচ আশীর্বাদী হাতে করে জ্ঞাতি কুটুম্বরা সব এসেছে, মনের কথা চেপে মুখে বলেছে, বেশ ব্যবস্থা হয়েছে- যে দিনকাল পড়েছে। সকলের হাতে হাতে উপহারের বাক্স বা প্যাকেট দেখে লজ্জায় বিয়েবাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করেছে। বিভাবতীর। মনে হয়েছে নেমন্তন্ন করে এনে খেতে না দিয়ে তিনি যেন ভিক্ষে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। শ্যামার বিয়ের সময় এক ঠোঁট-কাটা আত্মীয় তো বলেই বসল, আইনও রয়েছে আবার যার ইচ্ছে সে এরই মধ্যে দিব্বি খাইয়েও যাচ্ছে!

লজ্জায় মাথাই কাটা গিয়েছিল বিভাবতীর। আর চোখ ঠেলে বার বার জল আসছিল। কার নাতনীর বিয়েতে কি কথা শুনতে হল! অথচ রাগই বা করেন কি করে, মিথ্যে তো বলেনি। গত এক বছরের মধ্যে বিভাবতী কম করে দুতিনটে নেমন্তন্নে গেছেন, না খেয়ে তো ফিরতে হয় নি। কিন্তু কি করবেন, যেমন বরাত। শ্বশুর বেঁচে নেই রক্ষে। থাকলে হয়ত এই অপমানে প্রাণান্ত হত।

.

দিনকয়েকের জন্য বিভাবতী গেছলেন বড় মেয়ের বাড়ি–ব্যাণ্ডেলে। যাবার জন্য মেয়েটা কতবার যে লিখেছে ঠিক নেই। প্রথম ছেলে হবার পর থেকেই অসুখে ভুগছে। –দিনে দিনে হাড়সার হচ্ছে। মাস ছয় হল নাতির বয়স, ওটারও রিকেট না কি হয়েছে। যেমন বরাত। অবস্থা না হয় খারাপই হল, স্বাস্থ্যটাস্থ্যগুলোও তো একটু ভালো থাকতে পারে!

বিভাবতীকে বড় মেয়ের কাছে যেতে হয়েছে দিনকয়েকের জন্য। যাবার আগে শম্পাকে বাড়ির ব্যবস্থা শুধু বুঝিয়ে দেন নি–তাকে সকাল থেকে রাতের যাবতীয় কর্তব্য একের পর এক লিখে নিতে হয়েছে। আর যাওয়ার আগে পর্যন্ত বাড়ির কর্তাটিকেও ওষুধ-পথ্যের ব্যাপারে পাখী-পড়া করে বুঝিয়েছেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে দুর্গা দুর্গা করে রওনা হয়েছেন। ছেলের কলেজ, সে সেদিনেই বিকেলে আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু বিভাবতী চার দিনের বেশি ব্যাণ্ডেলে থাকতে পারলেন না। মেয়ের শরীর একটুও ভালো না, তার ওপর ছমাসের রোগে নাতিটা সারাক্ষণ কাদের থাকা দরকার ঠিকই, কিন্তু চার দিনেই হাঁফ ধরে গেল বিভাবতীর, মনে হল যেন চার সপ্তাহ কেটে গেছে। মেয়ে-নাতি অসুস্থ, কিন্তু ঘর-সংসার ফেলে কতদিন তিনি মেয়ের বাড়িতে বসে থাকতে পারেন? ওদিকে কি হচ্ছে ভেবে সারাক্ষণই ভিতরটা উতলা তার। ওখানেও তো হার্টের রোগী ফেলে এসেছেন একজন, সময়মত ওষুধ খাচ্ছে কিনা, পথ্য ঠিকমত পাচ্ছে কিনা কে জানে! যে দায়িত্বজ্ঞান আর এক মেরের! তাছাড়া সকাল সাড়ে নটা না বাজতে ওর কলেজে ছোটা আছে, শ্যামলেরও কলেজ আছে, খেলা আছে। কে কাকে দেখে!

চার দিনের দিন মেয়ের চেনা-জানা কলকাতার সঙ্গী পেয়ে তিনিও ঘোষণা করলেন, আর না, এবারে যাবেন। ছুটি হলেই শ্যামলকে পাঠিয়ে দেবেন, নিজেও ফুরসত পেলে আবার আসবেন–এখান থেকে এখানে, অসুবিধে কিছু নেই। একটানা আর থাকা সম্ভব নয়, ওখানে হয়ত সব অচল হয়ে আছে।

চলনদারকেও অসুবিধেয় ফেললেন না তিনি। হাওড়া স্টেশনে নেমে নির্দিষ্ট বাসে উঠে বসে তাকে বিদায় দিলেন। এ তো আর ব্যাণ্ডেল নয় যে পথ-ঘাটের হদিস পাবেন না তিনি! কোথায় নামতে হবে জানাই আছে। আর কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করেও অভ্যেস আছে, এক মাছ-তরকারির বাজার ছাড়া সব কেনা-কাটাই তো নিজের হাতে করেন।

.

শম্পা বাড়ি ছিল না। কলেজ থেকে ফিরেই বেরিয়েছিল কোথায়। ফিরল সন্ধ্যার একটু আগে। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে অর্থাৎ শ্যামলের সঙ্গে দেখা। ছোড়দির সাড়া পেয়েই ও হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে গলা খাটো করে বলল, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? মা চলে এসেছে–আর এসে পর্যন্ত কি কাণ্ড, কাছে যেতে ভয় করছে। প্রথমেই বাবাকে খামোকা যাচ্ছেতাই বকাবকি করে নিল খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে, আর একটু আগে ঝি-টাকে—

শোনামাত্র শম্পার খুশি মুখ থেকে প্রাণটুকুও যেন উড়ে গেল। সত্রাসে ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল খানিক, বলল, এত তাড়াতাড়ি তো ফেরার কথা ছিল না…

শ্যামল বলল, সেই জন্যেই তো আমিও হাঁ, তোকে বলে চুপি চুপি আজ একটা ছটার শো মারব ভেবেছিলাম-ভাগ্যিস যাই নি!

ভয়ে ভয়ে শম্পা জিজ্ঞেস করল, আমার কথা কিছু বলেছে?

না, তুই বাড়ি নেই–রাগের মাথায় এখনো খেয়ালই করে নি হয়তো। ব্যাণ্ডেলেই কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়, বড়দির অসুখটাই বেড়ে গেল কিনা বুঝছি না।

শম্পা বলল, অসুখ বেড়ে থাকলে মা চলে আসবে কেন?

শ্যামল বলল, অই তো–তবু সেখানেই নির্ঘাৎ কিছু হয়েছে, নইলে ফিরেই এই মূর্তি কেন? মা এখন বাবার ঘরে, তুই চুপি চুপি ঘরে গিয়ে ওই স্টাইলের শাড়ি পরা বদলে ঠিকঠাক হয়ে নে তো যা–

পাংশু মুখে পা টিপে শম্পা বারান্দা ধরে এগলো। এক সারিতে ছোট বড় তিনখানা। ঘর। প্রথম খুপরি ঘরটা শ্যামলের, বোনেদের বিয়ে হবার পর দ্বিতীয় ঘরটাতে এখন। শম্পা একাই থাকে। ঘরের আলো নেবানো। তার পরের ঘরটা বাবা-মায়ের–সে ঘরে আলো জ্বলছে।

নিজের ঘরের দোরগোড়ায় এসে শম্পা দাঁড়াল একটু, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা করল, বাপ-মায়ের ঘরের কোন কথা কানে আসে কিনা।

পরের মুহূর্তে যা ঘটে গেল, অস্‌ফুট আর্তনাদ করে উঠল শম্পা। আচমকা চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে কে তাকে তার অন্ধকার ঘরের মধ্যে এনে ফেলল। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে টাল সামলে আবার আর্তনাদ করে ওঠার উপক্রম।

চুপ!

মায়ের চাপা গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপর ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

সামনে মা দাঁড়িয়ে। দুচোখ ধকধক করে জ্বলছে। বি, এ, পড়া মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে এভাবে ধরে টেনে আনা কিছুই নয়, মায়ের এ-মূর্তি দেখে শম্পা থরথর করে কেঁপে উঠল।

বিভাবতী দেখছেন মেয়েকে, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখের আগুনে ঝলসে দিচ্ছেন। সমস্ত মুখ লাল, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প।

ওই ছেলেটা কে?

হিসহিস শব্দটা যেন এক ঝলক গলানো শিসের মতো কানে ঢুকল শম্পার। মাথাটা ঘুরে গেছে, চোখে লাল নীল সবুজ হলদে দেখছে।

তোকে আজ খুন করে ফেলব! রেস্টুরেন্টে বসে কার সঙ্গে ঢলাঢলি করছিলি আর গিলছিলি?

মা! ত্রাসে মায়ের হাত কিংবা পা ধরার জন্য এগিয়ে আসছিল শম্পা।

আবার এক ধাক্কা খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে মাটিতে বসে পড়ল। বিভাবতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরেই তাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ধাক্কা দিয়ে চৌকিতে বসিয়ে দিলেন–তোকে আমি মেরেই ফেলব আজ, বটি দিয়ে কাটব, শিক পুড়িয়ে তোর পিঠে ছ্যাকা দেব-বল শিগগীর ছেলেটা কে?

মা! বলছি মা, তুমি একটু স্থির হয়ে বোসো, তোমার পায়ে পড়ি মা

খবরদার! তুই আমাকে মা ডাকবি না। তিন দিনের জন্য গেছি, তার মধ্যে এই চরিত্র তোর? গলায় দড়ি জোটে নাকাল আমিই তোকে দড়ি এনে দেব– ভালো। চাস তো কে ছেলেটা আগে বল শিগগীর!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শম্পা বলল, ওই তিনতলা লাল বাড়ির

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কোন তিনতলা লাল বাড়ির।–ওই সামনের রাস্তার মুখের লাল বাড়ির?

শম্পা কাঁপতে কাঁপতে মাথা নাড়ল–তাই।

ঠিক এই জায়গায় বাইরে শৈলেশ চাটুজ্জের কোমল ডাক ভেসে এলো।

এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? শম্পা, তোর মা কোথায় রে, আমাকে ওষুধ দেবে না?

যাচ্ছি! জানালার দিকে চেয়ে তপ্ত একটা ঝাঁপটা মারলেন বিভাবতী, তারপর মেয়ের দিকে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, বসে থাক, এখান থেকে নড়বি তো আস্ত রাখব না।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

আতঙ্কিত শম্পা ধরেই নিয়েছে বাবাকে ওষুধ খাইয়েই মা এক্ষুনি ফিরবে। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। রাতে খাবার সময় হলো, তখন পর্যন্ত না। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাকে, থমথমে মুখ। একবার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, খেতে আয়!

ভয়ে ত্রাসে মুখ-হাত পর্যন্ত ধোয়া হয় নি তখনো। বসেছিল আর প্রমাদ গুনছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে এসে খেতে বসল। যে যার নিঃশব্দে খেয়ে উঠল। ছোড়দির মুখ দেখে শ্যামল বুঝে নিয়েছে সঙ্কটজনকই কিছু ঘটেছে। মা মাঝে মাঝে ছোড়দির দিকে যেভাবে চোখ বুলোচ্ছে তাতে তারই ভয় ধরে গেছে। আর ছোড়দিটা যেন বেঁচে নেই, কলের পুতুলের মতো হাত নড়ছে আর এক-একবার মুখে উঠছে।

খাওয়ার পাট চুকল।

সব গোছগাছ করে নিজের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে বিভাবতী হাত ধুয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কি জন্যে যে ঠাকুর তাঁকে এই দৃশ্য দেখালেন কে জানে! নইলে আজ তো তার ব্যাণ্ডেল থেকে আসারই কথা না।...মোড়ের মাথায় যেখানে বিভাবতীর বাস থেকে নামার কথা, তার খানিক আগেই নেমে পড়তে হয়েছিল। সামনে একগাদা গাড়ি আটকে গেছে, তাই নেমে পড়েছিলেন। গরমে সেদ্ধ হওয়ার থেকে এই দুমিনিট হাঁটা ভালো।

নেমে ওধারের ফুটপাথ ঘেঁষে আসছিলেন তিনি। ওখানে একটাই হালফ্যাশনের নামী রেস্তরাঁ আছে। ঘাড় ফেরাতেই হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। কোণের দিকে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে শম্পা আর কে একটা

ছেলে। দুজনে দুজনের দিকে ঝুঁকে কথা কইছে, এত নিবিষ্ট যে কোনদিকে চোখ নেই কারো।

ছেলেটার চেহারাপ ভালো, আর জামাকাপড়ও ফিটফাট। বিভাবতীর মাথায় তখন দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে–কলকাতার পথেঘাটে অমন ভালো চেহারা ফিটফাট হাড়-পাজী ছোকরা তিনি অনেক দেখেছেন।

কিন্তু স্বামীকে ওষুধ খাইয়েই তক্ষুনি আবার ফিরে এসে মেয়ের ওপর চড়াও হন নি তার প্রথম কারণ, মেয়েটা আরো ভয় পাবার অবকাশ পাক, দ্বিতীয় কারণ, তিনি কিছু ভাবছেন আর কিছু মনে করতে চেষ্টা করছেন।

নিঃশব্দে মেয়ের ঘরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করলেন তিনি। মেয়ের ফর্সা মুখ কাগজপানা হয়ে আছে দেখলেন। কাছে আসতেই শম্পা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

বোস!

দাবড়ানি খেয়ে বসে পড়ল আবার। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।–ওই লাল বাড়ির ছেলে মানে গাঙ্গুলি জজের বাড়ির ছেলে?

গাঙ্গুলি জজ বিশ বছর আগে পেনশন নিয়েছেন। পাড়ায় তাদের নামডাক প্রতিপত্তি মন্দ নয়।

শম্পা ঘাড় গোঁজ করে সামান্য মাথা নাড়ল।

গাঙ্গুলি জজের কে হয়?

ছেলে। শম্পার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না প্রায়।

কোন ছেলে?

ছোট।

পড়াশুনা কতদূর করেছে?

এক বছর আগে এম. এ. পাশ করেছে।

বিভাবতী তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখে নিলেন একটু। মেয়ে সত্যি বলছে কিনা সেটাই বোঝার চেষ্টা হয়তো!–এখন কি করে?

কলেজের প্রোফেসারি। শম্পার গলায় কি একটু আশার সুর বাজল? সাহস করে সে কি মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাবে? পারল না।

বিভাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, তোর সঙ্গে কদিন ধরে আলাপ?

শম্পা নিরুত্তর।

কদিন? বিভাবতী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আবার।

দু বছর।

বিভাবতী হতভম্ব খানিক। তারপরেই দাঁত কড়মড় করে বলে উঠলেন, দু বছর ধরে আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুই এই করে বেড়াচ্ছিস? তোর দিদিদের বিয়ের আগে থেকে?

শম্পার মুখ বিমর্ষ আবার। কেঁদে ফেলে বলে উঠল, তুমি বিশ্বাস করো মা, ও খুব ভালো ছেলে।

বিভাবতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খানিক। তারপর বললেন, কাল থেকে আমি না বলা পর্যন্ত তুই কলেজে যাবি না, আর বাড়ি থেকে এক পা বেরুবি না।

একে একে দুটো স্তব্ধ দিন কেটে গেল।

তৃতীয় দিনে লাল বাড়ির ছেলে কলে পড়ল। বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিল, বিভাবত কাজের অছিলায় বেরুলেন, তারপরেই খপ করে ছেলেটার হাত ধরে বললেন, তোমার বাড়িই যাচ্ছিলাম, ভিতরে এসো আমার সঙ্গে।

বিমূঢ় তটস্থ লাল বাড়ির ছেলেকে সোজা বাড়িতে টেনে নিয়ে এলেন তিনি। এনে তাকে নিয়ে সোজা শম্পার ঘরেই ঢুকলেন।

শম্পা আঁতকে উঠে দাঁড়াল।

তুই ও ঘরে যা!

হুকুম অমান্য করার মত বুকের পাটা নেই। করুণ চোখে একবার লাল বাড়ির। ছেলের দিকে তাকিয়ে শম্পা দুরুদুরু বক্ষে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বোসো।

চৌকির এক কোণে কাঠ হয়ে গেল ছেলেটা।

কি নাম?

সুনীল গাঙ্গুলী।

কি করো?

কলেজে পড়াই।

কোন কলেজে?

নাম বলল।

বিভাবতী এর পর বাড়িতে কে আছে না আছে, দাদারা কি করে না করে ইত্যাদি খবর নিলেন। বোনেদের কোথায় বিয়ে হয়েছে তাও শুনলেন। সবই মোটামুটি বড় ব্যাপার।

আমাদের অবস্থা কি জানো?

লাল বাড়ির ছেলে সুনীল মাথা নাড়ল–জানে।

আমাদের কিছু নেই জেনেও তোমার বাবা-মা এখানে তোমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন?

তারা রাজি হয়েছেন।

তুমি তাদের বলেছ?

হ্যাঁ। বাবা-মা শম্পাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে দেখেছেন, আলাপ করেছেন। এখন আপনাদের দিক থেকে প্রস্তাবের আশা করছেন তারা। কিন্তু শম্পা ভয়ে আপনাকেও কিছু বলছিল না, আমাকেও দেখা করে কিছু বলতে দিচ্ছিল না। কেবলই বলে বি. এ. পাস করার আগে কিছু হবে না।

বিভাবতী খানিক হাঁ করে চেয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। প্রথমে ঘাবড়ে গেছল, নইলে মুখে বোল আছে।

শম্পা! হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন তিনি।

শুকনো নতমুখে শম্পা দোরগোড়ায় দেখা দিল।

ঘরে কি আছে দেখ, সুনীলকে খেতে দে। আর শোন, আমি এক্ষুনি ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি যাচ্ছি।

সুনীল তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল, খাওয়া পরে হবে, আপনি চলুন না—

তুমি বোসো।

এই হুকুমের ধরণই আলাদা। সুনীল তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল। আর ব্যস্তসমস্ত শম্পা ছুটল রান্নাঘরের দিকে। আশায় আনন্দে থরথর করে কাঁপছে সে।

বিভাবতী লাল বাড়ি থেকে ফিরলেন যখন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুনীলই পৌঁছে। দিয়ে গেল। শম্পা উদগ্রীব হয়েই ছিল সারাক্ষণ। কিন্তু মায়ের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, ভালো খবর কি খারাপ খবর। খারাপ খবর হবার তো কোন কারণ নেই, তবু ত্রাস যায় না। মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে মা কিছু করে আসতে পারে বলেই ধারণা নেই তার।

তোর বাবাকে ঠিকমত ওষুধ খাইয়েছিস?

মাথা নাড়ল খাইয়েছে।

তিনি সটান নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বেরিয়ে মেয়ের ঘরে এলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। শম্পা শয্যায় বসেছিল। সচকিত।

চুপচাপ তিনি মেয়েকে দেখলেন একটু। বললেন, সামনের এই দশ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে চায় ওরা–তা না হলে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এই তিন মাস আর হবে না।

বুকের ভিতর থেকে শম্পার একটা বোঝা নেমে গেল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল সে। কিন্তু মায়ের মুখখানা যেন অদ্ভুত শান্ত মনে হলো তার। আর তারপর যা ঘটল শম্পা কল্পনাও করতে পারে না। মা হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুহাতে বুকে টেনে নিল তাকে। তারপর আরো আশ্চর্য, মায়ের চোখে জল বুক চেপে ধরে মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দের আবেগে শম্পা দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিভাবতী নিঃশব্দে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন।

.

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন বিভাবতী। সমস্ত গা কাঁপছে। ঘামছেন দরদর করে। ঘন অন্ধকার।

এ কি দেখলেন তিনি? এ কি দেখে উঠলেন?

তিনি দেখলেন, ঘুমের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখলেন, বিগত শ্বশুর খাচ্ছেন আর হাসছেন হাসছেন আর খাচ্ছেন। মাছ মাংস পোলাউ

www.bengaliebook.com

রসগোল্লা সন্দেশ সব পরিপাটি করে খাচ্ছেন। খাচ্ছেন আর বলছেন, বেটি সেয়ানা বটে, বেশ করেছে, নিজেরটা নিজেই যোগাড় করে নিয়েছে! খেয়ে বড় তৃপ্তি হল গো বউমা।

এ রকম স্বপ্নও দেখে কেউ? বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকি, দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই বিভাবতীর। এই কদিনে তিন ঘণ্টা করেও ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। বেশি রাতে শুয়েছিলেন আজও। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র ঘুমিয়েছেন। তার মধ্যে এই স্বপ্ন।

সকালে উঠেও অনেকক্ষণ বিমনা তিনি। কদিন ধরে ভিতরটা তার খুঁতখুঁত করছিল ঠিকই। আবার সেই জলযোগের ব্যবস্থার নামে গায়ে জ্বর আসছিল। কেবলই ভাবছিলেন কি করা যায়! স্বপ্ন দেখা আশ্চর্য নয়, কিন্তু শ্বশুর এভাবে খাচ্ছেন আনন্দ করছেন এই স্বপ্নই কল্পনাতীত।

ছেলের পক্ষ ধরেই নিয়েছে, শুধু মেয়েটি ঘরে আসবে, তার সঙ্গে আর বেশি কিছু নয়। তবু যতটা পারা যায় করবেন ঠিক করেছিলেন বিভাবতী। মেয়ের বরাতে বড় ঘর জুটেছে, অতিরিক্ত ভালো জামাই জুটেছে। মেয়ের বড় ভাগ্যটা তিনি একেবারে ছোট করে শুরু করাবেন না। যথাসাধ্য করবেন। এই যথাসাধ্য করার হিসেব দাঁড়িয়েছে আট হাজার টাকা। বিভাবতীর কল্পনার বাইরের অঙ্ক প্রায়। স্বামী প্রভিড়ে ফাণ্ড গ্রাচুইটি ইত্যাদির ইত্যাদির সব টাকা কুড়িয়েবাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে উনিশ হাজার টাকা তার হাতে দিয়েছিলেন। ওই যথাসর্বস্ব। ছেলে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আর কপর্দক ঘরে আসারও সম্ভবনা নেই। তবু তাই থেকে আট হাজার টাকা খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন বিভাবতী।

স্বপ্ন দেখার ফলে বিকেলের মধ্যে প্ল্যান আরো অনেকটা প্রশস্ত রাস্তায় এগিয়ে চলল। কাউকে কিছু না বলে বাসে চেপে ভাগ্নের বাড়ি চলে গেলেন তিনি। ভাগ্নেটা করিতকর্মা লোক। তার সঙ্গে বসে নতুন করে আর একটা হিসেব করে ফেলা হল। দুশ সোয়া দুশ লোককে পেটপুরে খাওয়াতে কম করে আরো দু হাজার টাকা লাগবে। যা তিনি খাওয়াতে চান, এর কমে হবেই না।

বিভাবতী বললেন, ঠিক আছে, তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও। সব যোগাড়যন্ত্র করতেও তো প্রাণান্ত ব্যাপার!

সেদিক থেকে ভাগ্নে তাকে নিশ্চিন্ত করল।

খুশিমনে বিভাবতী বাড়ি ফিরলেন। তার মস্ত একটা দুর্ভাবনা গেল। কেবলই মনে হল, মেয়ের কল্যাণের জন্য শ্বশুরই এভাবে তার দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলেন। পরে যা হবার হবেই। আর এতে মেয়ের মঙ্গলও হবেই। ইতিমধ্যে সকালেই তিনি পাড়ার বিয়েবাড়ির একতলা ভাড়া করে এসেছেন। নিজেদের আড়াই ঘরে কিছুই হবে না। বাড়ি থেকে মিনিট তিনেকের পথ ওই বিয়েবাড়ি। দোতলায় বাড়ির মালিক থাকে, একতলা বিয়ের দরুন ভাড়া দেওয়া হয়। তা সেও শ্বশুরের আশীর্বাদে আর মেয়ের ভাগ্যে একটু সুবিধেতেই পেয়েছেন তিনি। বিয়ের দিন সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ভাড়া একশ টাকায় রফা হয়েছে।

খরচ আট হাজার থেকে এক লাফে দশ হাজারে উঠে গেল। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় একটুও উতলা নন তিনি। মেয়ের কল্যাণ হবে মেয়ে সুখী হবে এটাই যেন বড় কথা।

বাড়ির কর্তা অর্থাৎ শৈলেশ চাটুজ্জে খোঁজ নিতে চেষ্টা করেন, কি হচ্ছে বা কি হবে! বিভাবতী ধমকেই ঠাণ্ডা করেছেন তাকে, যা হবে তা হবে, তোমাকে কে মাথা ঘামাতে বলেছে? ভাবনা-চিন্তা করে আবার হার্ট ধরে বসে পড়ো!

আমতা আমতা করে ভদ্রলোক বলেন, ইয়ে, আমি তো বেশ ভালই আছি এখন।

বিভাবতী রেগে যান, ভালো আছ সেটা আর সহ্য হচ্ছে না, কেমন? তাহলে তুমিই সব ব্যবস্থা করো, আমি গিয়ে শুই!

স্বামীটি সুড়সুড় করে ঘরে পালিয়ে বাঁচেন।

কিন্তু ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন বিয়ের রাতে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়েবাড়ির এলাহি ব্যাপার দেখে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করেছেন তিনি। এক-একবার এক-একদিকে ঘুরে দেখছেন, আবার চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকছেন।

অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর দিকে চোখ পড়ল বিভাবতীর। তক্ষুনি ছেলেকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে ছাড়লেন তাকে। বললেন, বিয়ে তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে গিয়ে খানিক চুপচাপ শুয়ে থাকোগে যাও–একটু বাদে আমি দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেন, আমি তো ভালই আছি।

আঃ, যাবে তুমি?

তৎক্ষণাৎ প্রস্থান। স্ত্রীর মন ভালো না, জানেন। বড় মেয়ের শরীর খারাপ, বাচ্চাটার আরো খারাপ–তাকে আনতে পারেনি। স্ত্রীর চোখে কতবার যে জল এসেছে আর শুভদিনের অমঙ্গলের আশঙ্কায় সেই জল ঠেকিয়ে রেখেছে–সে শুধু তিনিই জানেন। বড় মেয়ে আসতে না পারার দরুন স্ত্রীর এত মন খারাপ দেখেই তারও মনটা বিষণ্ন।

ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন তিনি, জামা-কাপড় ছাড়লেন না– একটু বিশ্রাম করে স্ত্রীর মন বুঝে আর একবার ওদিকে যেতে চেষ্টা করবেন। যে দুধ নিয়ে আসবে তারই মারফৎ স্ত্রীর অনুমতি চেয়ে পাঠাবেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দুধের গেলাস হাতে স্ত্রীই হাজির। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, আবার তুমি কেন?

ঘামে জবজব করছে বিভাবতীর মুখ, আর পরিশ্রমে বড় বেশি লাল হয়েছে। এক চুমুকে দুধের গেলাস খালি করে জল খেলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সব খেতে বসে গেছে?

এক ব্যাচ হয়ে এলো। তোমার কেমন লাগছে এখন?

www.bengaliebook.com

খুব ভালো, একবার ঘুরে আসব?

না, তোমাকে এক্ষুনি ব্যাণ্ডেলে যেতে হবে, বিশু ঠাকুরপোর নতুন গাড়িটা পেয়েছি, তোমার কিছু কষ্ট হবে না–পাকা ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শৈলেশ চাটুজ্জে হতভম্ব হঠাৎ। কি শুনছেন ঠিক যেন বুঝছেন না। বিশু ঠাকুরপো মানে তার বড়লোক বাল্যবন্ধু বিশ্বেশ্বর ঘোষ? বললেন, আমি–মানে এখন ব্যাণ্ডেলে যাব?

হ্যাঁ, সবে তো রাত আটটা এখন, দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। কেবলই মনে হচ্ছে মেয়েটা ছটফট করছে আর কাঁদছে–জামা-কাপড় তো পরাই আছে দেখছি, এই টাকা কটা রাখো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর দেরি কোরো না, এক্ষুনি চলে যাও। গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ারে রমা আর ওদের সকলের জন্য খাবার দিয়েছি–খায় যেন। আর তুমি গিয়েই যেন কাল-পরশুর মধ্যে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, এই গণ্ডগোলের মধ্যে থাকলে তোমার হার্ট আরো খারাপ হয়ে যাবে। তিন চার দিনের মধ্যে এদিকের সব চকলে আমিও যাচ্ছি–একসঙ্গে ফিরব। এই নাও, পকেটে তোমার ওষধ কটা নিয়ে নাও।

কথা বলারও ফুরসত পাচ্ছিলেন না শৈলেশ চাটুজে। এবারে বললেন, কিন্তু আজই কেন…কাল না হয় যাব…তাছাড়া আমি তো এখন বেশ…

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তুমি উঠবে? তুমি না গেলে এক্ষুনি আমি যাব!

যাচ্ছি, যাচ্ছি, কিন্তু

আর কিন্তু না, শিগগীর ওঠো! লক্ষ্মীটি, তুমি মেয়েটার কাছে না গেলে আমার একটুও ভালো লাগছে না। এদিকে আমি সব সামলে নিতে পারব

শৈলেশ চাটুজ্জে নীরবে তাকালেন একবার। তার মনে হল, স্ত্রীর চোখে জল বুঝি ভেঙেই পড়বে। আর একটি কথাও না বলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তারপর নিঃশব্দেই গাড়িতে এসে উঠলেন। গাড়িটা চলে গেল।

www.bengaliebook.com

বিভাবতী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বিয়েবাড়ির দিকে চললেন। শুকনো দুচোখ খরখর করছে এখন।

হ্যাঁ, দশ মিনিট সময় নিয়েছিলেন, তার মধ্যেই ফিরেছেন তিনি।

বিয়েবাড়ির এদিকটায় চাপা উত্তেজনা একটা। বিভাবতী জানেন কিসের উত্তেজনা, কেন উত্তেজনা?

স্থির পায়ে এগিয়ে এসে পাশের একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন তিনি। সেই ঘরে তিনজন পুলিশ এবং দুজন তাদের ওপরঅলা ভদ্রলোক।

তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন বিভাবতী, কি বলবেন বলুন?

প্রধান অফিসারটি বললেন, যাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি কোথায়?

আমারই মেয়ের বিয়ে।

সিঁথির সিঁদুরের দিকে চোখ গেল অফিসারের।

আপনার স্বামী কোথায়?

তিনি অসুস্থ, কলকাতায় নেই। আমার বড় মেয়েও অসুস্থ, আসতে পারেনি, তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অফিসারের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তিনি এখানে নেই?

না। বললাম তো তিনি অসুস্থ, হার্টের রোগী, বাড়িতে ডাক্তারের প্রেসকৃপশন আছে একগাদ, দেখতে পারেন।

নেমন্তন্ন চিঠি কার নামে ছাপা হয়েছে?

নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানো হয়নি, ওসব বাজে খরচ করার পয়সা নেই।

একজন কেউ তো দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করিয়েছেন, তাকে ডাকুন।

আমিই দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করেছি, আর কেউ করেনি।

ও…। অফিসারের তির্যক দৃষ্টি, লোক তো অনেক দেখছি, কত লোক খাওয়াচ্ছেন?

দু'শ।

লিখে নিলেন। কি খাওয়াচ্ছেন একবার দেখতে চাই।

দেখলে খেয়ে যেতে হবে। আসুন–

অফিসার কেন যেন এগোতে পারলেন না। বললেন, অপরাধ নেবেন না, আমরা কর্তব্যের দায়ে এসেছি, খেতে পারব না।

আমি কর্তব্যে বাধা দেব না, খেয়ে গেলে আমার মেয়ের কল্যাণ হবে। এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি

না না না। অফিসার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মহিলার দিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন কেন। আচ্ছা আপনি বলুন, কি খাওয়াচ্ছেন?

লুচি মাছ মাংস পোলাও দই রসগোল্লা সন্দেশ

অফিসার লিখে নিলেন। সক্কলের জন্য এই ব্যবস্থা?

সক্কলের জন্য।

আবার লিখলেন। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু এসব তো আইনে নিষেধ করা আছে…একটু মুশকিল হলো!

আমাকে এখুনি থানায় যেতে হবে?

অফিসার মুখ তুলে তাকালেন, কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারলেন না। একটু ভেবে বললেন, না, আপনি যা বললেন…এতে একটা সই করে দিলেই হবে।

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন, কলম এগিয়ে দিলেন।

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে বিভাবতী নাম সই করলেন। নির্দেশমত বসতবাড়ির ঠিকানাও লিখে দিলেন।

সদলবলে অফিসার চলে গেলেন। ঘরের বাইরের চাপা উত্তেজনা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আবার। এদিকের একটা ঘরে কি ঘটে গেল, বিয়েবাড়ির অন্দরমহলের কেউ কিছু জানতেও পারল না।

.

আসামী বিভাবতী চট্টোপাধ্যায়ের কথাবার্তা শুনে তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট কৌতূহল বোধ করছেন বেশ। ঘরের অনেকে হাসছেও মুখ টিপে। একধারে শুধু নতুন মেয়ে জামাই, বর্ধমানের মেয়ে জামাই আর ছেলের মুখ শুকনো।

বিভাবতী উকীল দেননি। বর্ধমানের মেজ জামাই সে চেষ্টা করতে গিয়ে ধমক খেয়ে বিরত হয়েছে। শাশুড়ী বলেছেন, নিজের ওকালতি নিজেই তিনি করতে পারবেন, এর জন্যে লোক ভাড়া করার দরকার নেই।

করেছেনও। তার বক্তব্য, স্বামীর উনিশ হাজার টাকা সম্বলের মধ্যে দশ হাজারের ওপর খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যত ভাবতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখার কথা–এই খরচ তিনি সখ করে করেননি, ফুর্তি করার জন্যও না। করার দরকার হয়েছিল তাই করেছেন।

তিনি স্বীকার করেছেন, দুশ লোক নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, আর যা-যা খাওয়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ, তাও সবই স্বীকার করেছেন, শুধু তিনি দোষী এটুকুই অস্বীকার করেছেন।

তরুণ বিচারক প্রশ্ন করলেন, পঞ্চাশজনের বেশি লোককে এসব খাওয়ানো নিষেধ, আপনি জানতেন না?

জানতাম। এরকম রাজ্যি-ছাড়া নিষেধ আমাদের ভিতরে পৌঁছয় না।

কেন?

কেবল নিষেধ, আর কেবল নেই! সত্যিই নেই বুঝতে পারলে কারো নিষেধ করার দরকার হত না।

সম্ভব হলে বিচারক এই আসামীটিকে মুক্তিই দিতেন বোধ করি। একেবারে ন্যুনতম লোক-দেখানো শাস্তিই ঘোষণা করলেন তিনি। বিভাবতীর পঁচিশ টাকা জরিমানা হল, অন্যথায় তিন দিন জেল।

তিন দিন জেলের উক্তি নিয়ম-রক্ষার্থে, পঁচিশ টাকা জরিমানাতেই এই বিচার-পর্ব শেষ হবে জানা কথা। কিন্তু আসামীর প্রশ্ন শুনে ভিতরে ভিতরে হয়ত অস্বস্তিই বোধ করলেন বিচারকটি। বিভাবতী তার দিকে স্থির তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পঁচিশ টাকা জরিমানা না দিলে তিন দিন জেলে থাকতে হবে?

তরুণ বিচারক মাথা নাড়লেন।

আপনাদের জেলে ভদ্রঘরের মেয়েদের রাখার ঠিক ঠিক ব্যবস্থা সব আছে তো?

বিব্রত মুখে আবারও মাথা নাড়তে হল বিচারককে। তারপর তেমনি বিড়ম্বিত। মুখে তার আত্মীয়-পরিজনদের দিকে তাকালেন তিনি।

বিভাবতী বললেন, পঁচিশ টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, তিন দিন জেলেই থাকব। ছেলে আর মেয়েদের দিকে ফিরলেন তিনি, তোরা বাড়ি যা- তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর সাবধান ব্যাণ্ডেলে যেন কেউ কিছু না জানায়।

নিরুপায় জামাই দুটি শাশুড়ীর অলক্ষ্যে বিচারকের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে কি বোঝাতে চেষ্টা করল তারাই জানে। তিনি উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও অদৃশ্য। একটু বাদেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরল তারা। বিভাবতী অবাক হয়ে দেখলেন তাঁকে কেউ জেলখানায় নিয়ে যেতে এলো না। শুধু মেয়েরাই খুশিমুখে এগিয়ে এলো। শম্পা বলল, চলো মা, এবারে বাড়ি চলো– তুমি দেখালে বটে, হাকিম তোমার জরিমানা মকুব করে দিয়েছেন।

জরিমানা সত্যিই যে এভাবে মকুব করা যায় না, বিভাবতীর তা জানার কথা নয়। তবু সন্দিগ্ধ। জামাইদের দিকে তাকালেন, সত্যি না তোমরা জরিমানা গুনে দিয়ে এলে?

প্রাণের দায়ে মেজ জামাই আর নতুন জামাই ঘন ঘন মাথা নাড়ল। আর মেয়েরা বলে উঠল, তোমার কাছে মিথ্যে বলার সাহস আছে নাকি আমাদের, চলো শিগগীর।

আশ্বস্ত হয়ে সকলকে নিয়ে বিভাবতী বাইরের বারান্দায় এসেই তপ্ত মুখে গজ গজ করে উঠলেন, আমাদের সময় মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ীরা বলত, কখনো নেই বলতে নেই- আর এদেশের লোক হয়ে আইন করে হাঁকডাক করে নেই-নেই রব তুলে দিয়েছে একেবারে–লজ্জাও করে না!

পরক্ষণে কি মনে পড়তে থমকালেন একটু, পা-ও থেমে গেল। ছেলের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, এখনো তো বেলা পড়েনি, তুই এক কাজ কর তো, এক্ষুনি ব্যাণ্ডেলে চলে যা, তোর বাবাকে নিয়ে আয়–কি ভাবে আছে কে জানে, সঙ্গে টাকা আছে? আছে? যা তাহলে–যাবি আর আসবি, আর সাবধানে নিয়ে আসবি

গল্পটা এই।

তখনো ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম অর্থাৎ নামী আর মোটামুটি নামী লেখকদের মত আর মন্তব্য বিশ্লেষণ করছিলাম।

দীর্ঘদিন ধরে নিজে সাহিত্য করছি, কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে অনেক গল্প লিখেছি, আর সেই সঙ্গে কড়া সম্পাদক হিসেবে কিছু সুনাম আর দুর্নাম কুড়িয়েছি। তবু সতীর্থদের মতামত আর মন্তব্যের সঙ্গে নিভৃতের অনুভূতির তেমন যোগ হচ্ছে না কেন?

প্রথম, নতুন লেখক যে বলেছে, গল্পটা সত্যের ছায়া নিয়ে লেখা–সেটা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না কেন?

দ্বিতীয়, বিভাবতীর যে কথাবার্তা আচার-আচরণ লেখক বন্ধুদের অবাস্তব মনে হয়েছে, তার একবর্ণও বদলালে গল্পটা বর্ণশূন্য হয়ে যাবে মনে হচ্ছে কেন?

তৃতীয়, গল্পটা নিছক উদ্দেশ্যমূলকই যদি হয় তো, ও-রকম একটি মহিলাকে সচক্ষে দেখার লোভ হচ্ছে কেন?

চতুর্থ, শ্রোতা-লেখকদের মন্তব্য অনুযায়ী গল্প থেকে হার্টের রোগী ভদ্রলোকটিকে উড়িয়ে দিয়ে, অর্থাৎ মহিলার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে এই গল্পটা জটিলতা-মুক্ত করে। তোলার কথা ভাবতেও বুকের ভিতরে বাতাসের অভাব বোধ করছি কেন?

আর সব শেষে, যে মেয়ের মঙ্গল আর কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় মহিলার উনিশ হাজার টাকা সম্বলের থেকে দশ হাজার খরচ করার প্রেরণা আর অনায়াসে আইন ভঙ্গ করার তাড়না- কল্পনায় সেই মেয়ের মাথায় হাত রেখে কেন বলতে ইচ্ছে করছে, মঙ্গল হোক, সুখী হও!

গল্পটা ছাপব কিনা এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি।

মেজর সেবকরাম

সন্ধ্যার পর আজ বেশ একটু সময় নিয়ে আর বেশ একটু যত্ন করে প্রসাধন পর্বে মনোনিবেশ করেছেন মিসেস সেবকরাম। মুখখানা হাসি-হাসি। হাসি-হাসি কেন, আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসছেনও মিটিমিটি। কিছুদিন আগেও পার্টি শুনলে গায়ে জ্বর এসেছে। গোমড়ামুখ করে প্রসাধন সেরেছেন। বিশেষ করে মেস ক্লাবের ডিনার পার্টি শুনলে না যাবার ফিকির খুঁজেছেন এই বয়সেও। যে হৈ-হুল্লোড় কাণ্ড সব, বয়সের বাছবিচার নেই, ছেলে-বুড়োতে মিলে ফষ্টি-নষ্টির হাট! মিসেস সেবকরাম একবার এক বছরের একটা লিস্ট করেছিলেন–গোটা বছরে কতগুলো পার্টি হল। তাতেও অফিস পার্টি অর্থাৎ যাতে তাদের নিমন্ত্রণ নেই, সেগুলো বাদ দিয়েছিলেন। তারপর কর্তাকে ঠাট্টা করেছিলেন, মিলিটারী চাকরি মানে তো শুধু পার্টি আর পার্টি!

এই ঠাট্টার পরেই অবশ্য দুর্দৈব ঘটেছিল। চীনা আক্রমণে হিমালয়ের শান্তি নড়ে উঠেছিল। তখন এক এক কর্মক্ষেত্রেরই আবার আর এক রূপ দেখেছেন মিসেস সেবকরাম। সার্ভিসের লোকগুলোকে নিয়ে যেন হরির লুট লেগেছিল। কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল ঠিক নেই। আজ যে এখানে কাল সে কোন সীমান্তে ঠিক নেই। সেদিনের কথা মনে পড়লেই একখানা হাসি-হাসি-মুখ বুকের তলায় খচখচ করে মিসেস সেবকরামের। তার থেকে অনেক ছোট অথচ কি নজরে যে দেখেছিল তাকে, কে জানে।–ক্যাপ্টেন বিঠঠল; বড় জোর চল্লিশ হবে বয়স। মিসেস সেবকরাম কোন পার্টিতে গেলেই কাছে কাছে ঘুরঘুর করত, তিনি এদিক ওদিক তাকালেই পাঁচবার করে ছুটে আসত কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করতে। চাই বললে খুশি হত, চাই না। বললে মুখখানা বেজার করত। মিসেস সেবকরাম তার ওপরঅলার স্ত্রী, সেই হিসেবে। কিছুটা অনুকম্পার পাত্র। তা এসব পার্টিতে লেডিদের অনুকম্পার পাত্র সকলেই—-সে লেফটেনেন্ট কর্ণেলই হোক আর নবাগত লেফটেনেন্টই হোক। সম্মিলিত পার্টিতে সামান্য অফিসারের স্ত্রীর রাজরাণীর মর্যাদা।

তবু বড় অফিসারদের স্ত্রীদের ছোট অফিসাররা নিজেদের অগোচরেও কিছুটা সমীহ করে থাকে। কিন্তু সেদিন ক্যাপ্টেন বিঠলের পানের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। সবিনয়ে চুপি চুপি প্রস্তাব করেছিল, মাদাম, আজ যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে নাচেন! মিসেস সেবকরাম পার্টির এই অধ্যায়টা বরাবর সন্তর্পণে পরিহার করে এসেছেন। আঠার-কুড়ি বছর বয়স থেকেই এই এক ধকল তাঁকে সামলে আসতে হয়েছে। বুড়ো বুড়ো ওপরঅলা অফিসারগুলো পর্যন্ত হ্যাংলার মত এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে। কিন্তু মিসেস সেবকরাম নাচ শেখেনইনি মোটে। গোড়ায় গোড়ায় মেজর চেষ্টা করেছিলেন শেখাতে–অবশ্য চেষ্টা যখন করেছিলেন তখন তিনি মেজর নন, নতুন বয়সের লেফটেনেন্ট। ছদ্ম কোপে তখন চোখ পাকিয়েছেন মিসেস সেবকরাম, তোমাদের মিলিটারী চাকরিতে এত বউ ধরে টানাটানি কেন, নিজেরা যা করছ করোগে।

কিন্তু এই বয়সে বিঠঠলের ওই প্রস্তাবে যেমন অবাক হয়েছেন তেমনি বিরক্ত হয়েছিলেন। মেজরকে বলেছিলেন, ছোকরার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো, ওর মাথায়। গণ্ডগোল হয়েছে, আজ আবার আমার সঙ্গে নাচতে চেয়েছিল!

মেজর সেবকরাম হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, এবার থেকে তোমার বয়সের একটা কার্ড তুমি গলায় ঝুলিয়ে যেও।

সেই ক্যাপ্টেন বিঠঠলের বিদায় পার্টি ছিল সেদিন–সুদূর ফ্রন্ট-এ হাজিরা দেবার নির্দেশ এসেছিল তার উপর। বিদায় সম্বর্ধনার পরে মেজরের সামনেই সে এসেছিল মিসেস সেবকরামের কাছে। সৌজন্যের রীতি অনুযায়ী মিসেস সেবকরাম তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, সুস্থ পরমায়ু কামনা করেছিলেন। ছেলেটা চুপচাপ খানিক তাকিয়েছিল তার দিকে, তারপর অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, আপনার হাতখানা ধরতে। পারি?

মিসেস সেবকরাম বিব্রত বোধ করেছিলেন, ওদিকে স্বামী নীরবে একটু ইশারা করেছিলেন। মিসেস সেবকরাম একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুই হাতে প্রগাঢ় আবেগে সেই হাতখানা নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়েছিল ক্যাপ্টেন বিঠঠল। তারপরেও ধরে রেখেছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, মাদাম, এই দুটো বছর আপনাকে বড় ভালো লেগেছে। হাসি-খুশি দরদ মর্যাদাবোধ–সব মিলিয়ে আপনাকে দেখলেই মনে হয়েছে, ইউ রিপ্রেজেন্ট মাদার ইণ্ডিয়া।

মিসেস সেবকরাম স্বামীর দিকে চেয়ে দেখেছেন, চোখ দুটো তার অদ্ভুত চকচক করছে। দেশের প্রসঙ্গে এই চোখ তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন।

মাসখানেকের মধ্যে ফ্রন্ট থেকে ক্যাপ্টেন বিঠঠলের মৃত্যুসংবাদ এসেছে। তার। বীরত্ব আর দুঃসাহসিক মৃত্যুবরণের বিবরণও এসে পৌঁচেছে। সকলে গর্ব অনুভব করেছে। গোপনে অনেকবার চোখের জল মুছেছিলেন মিসেস সেবকরাম।

এর কিছুদিন বাদেই নিজের স্বামীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মেজরকে হাজিরা দিতে হয়েছে সুদূর লদাকে। সেই দীর্ঘ সময়টা কি ভাবে কেটেছিল মিসেস সেবকরামের তিনিই জানেন। এই দুটো ঘটনার পর থেকে বাকি একটা বছর পার্টির অনেক প্রগলভ হৈ-চৈ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অশালীন ফুর্তি দেখেও তিনি বিরক্ত হননি।...আহা, কে কবে আছে আর নেই কে জানে, জীবনের তো এই দাম সব!

কিন্তু আজ নিজের খুশির আমেজেই সুচারু প্রসাধন সম্পন্ন করছেন মিসেস সেবকরাম। তার বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। চুলের বোঝার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলোতে পাক ধরেছে। কিন্তু সাজগোজ করে পার্টিতে গেলে সেখানকার পঞ্চাশোর্ধরা তার দিকেই বেশি ঘেঁষে। মেজরের এখন আটান্ন, সব চুল সাদা। দুই ছেলে মিলিটারী কলেজে ভবিষ্যৎ সৈনিক হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মেজর ঠাট্টা করেন, আমার সঙ্গে তোমার পার্টিতে যাওয়ার অনিচ্ছার কারণটা বুঝতে পারি, ছেলেদের যখন বড় বোন ভাবে লোকে তোমাকে, আমাকে কি ভাবে কে জানে!

এই বেপরোয়া রসিকতারও হেতু আছে। ছেলেরা সেবারে ছুটিতে বাড়ি আসতে একজন সদ্য পরিচিত ভদ্রলোক মিসেসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এঁরা দুটি আপনার ছোট ভাই নাকি?

কিন্তু মুখে যাই বলুন মেজর, তার ওই চুলই শাদা হয়েছে। এখনো চওড়া বুকের ছাতি, পরিপুষ্ট হাতের কব্জা। আনন্দে অনেক নব্য তরুণের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেন। যখন, তাদের কাঁধের হাড়ে লাগে। এই রসিকতা শুনলেই মিসেস সেবকরাম রাগ করেন আবার হেসে ফেলেন।

কিন্তু প্রসাধনরত মিসেস সেবকরাম আজ হাসছেন অন্যকারণে। আজকের বিশেষ পার্টি বিশেষ করেই তাদের জন্যে–সেই কারণেও নয়। জীবনের এক বিরাট অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন মেজর সেবকরাম–সেই বিদায়। উপলক্ষে এই সাড়ম্বর পার্টি। কিন্তু মিসেস সেবকরামের ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের। হাসিটুকু লেগে আছে একেবারে ভিন্ন কারণে। আজও এই খানিক আগে স্বামীর সঙ্গে সেই

চিরাচরিত ব্যাপার নিয়ে ছদ্ম বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে একপ্রস্থ। ঠোঁটের হাসিটুকু তারই রেশ। মেজর বলেছিলেন, যার জন্যে জীবনের ঠিক এইখানটায় আজ এসে দাঁড়ানো গেছে, তাকে সত্যি সত্যি কেউ চিনল না।

মিসেস সেবকরাম হাসি চেপে দেয়ালের মস্ত অয়েলপেন্টিং ছবিটা দেখিয়ে নিরীহ মুখে জবাব দিলেন, কর্নেল ব্রাউনের কথা বলছ?...চিনবে না কেন, মস্ত নামী লোক তার ওপর তোমার মত এমন একজন মেজর তৈরি করে গেল!

সেবকরাম মাথা নেড়েছেন, কর্নেল ব্রাউন নয়, আমি আমার ঝুমরির কথা বলছি। আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়ানোর পিছনে ঝুমরিবাঈয়ের কেরামতি কতখানি কেউ জানলই না, বোকাগুলো জীবনভোর শুধু আমাকেই বাহবা দিয়ে গেল।

মিসেস সেবকরামের নাম ঝুমরিই বটে, ঝুমরিবাঈ। কিন্তু এখন ভদ্রলোকটিও তাকে ঝুমরি বলে ডাকলে লজ্জা-লজ্জা করে–কেমন ছেলেমানুষ লাগে নিজেকে। ছেলেদের সামনে ডাকলে তো চোখ রাঙান তিনি। মহিলাদের উদ্যোগের কোনো চাঁদার খাতাটাতায় সই করতে হলেও সংক্ষেপে লেখেন মিসেস জে, সেবকরাম। ঝুমরিবাঈ শুনলে তবু একরকম, শুধু ঝুমরি শুনলে বয়স যেন অর্ধেক কমে যায়।

সেই রকমই ভ্রূকুটি করেছিলেন ঝুমরিবাঈ, এই প্রসঙ্গ উঠলে যেমন করে থাকেন। বলেছিলেন, হুঃ, আমার কেরামতি কত জানা আছে! আসলে যার কেরামতি সে তোমার ওই গলায় ঝুলছে–তোমার এই চাটুবাক্যে যে ভুলবে সে একটি আস্ত বোকা!

মেজরের গলায় ঝুলছে বড় লকেটসুষ্ঠু একটা হার। আজ ছত্রিশ বছর ধরেই এটা গলায় ঝুলছে তার। ছত্রিশ বছর আগে প্রথম যখন ফৌজের চাকরিতে ঢোকেন তিনি–তার ঠাকুরদা এটি উপহার দিয়েছিলেন তাকে।

উপদেশ দিয়েছিলেন, মন্ত্রপূত কবচের মত এটি যেন সর্বদা গলায় রাখা হয়। ঠাকুরদা ছিলেন দূর অতীতের স্বাধীন মারাঠা বীর সৈনিকবংশের সন্তান।

পরদেশী ফৌজে চাকরি নেবেন তাঁর নাতি এটা আদৌ মনঃপূত ছিল না। নিলেনই যখন, এটা তখন তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার দেশের সম্মান তোমার গলায় থাকল। সেই থেকে অনেকবার হার ছিঁড়েছে আর বদলেছে, কিন্তু মূল জিনিস অর্থাৎ সেই লকেট তেমনি আছে। ঝুমরিবাঈ এটা ইঙ্গিত করেই মুখঝামটা দিয়েছিলেন। আর তারপর প্রসাধন করতে করতে আপনমনেই হাসছিলেন।

.

সভার মধ্যে মেজর যে এই কাণ্ড করে বসতে পারেন, ঝুমরিবাঈ তা কল্পনাও করেননি।

জীবনের যে একটি বিশেষ ঘটনা মেজরের কর্মজীবনে সোনার অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই কাহিনীটিই আন্তরিক আনন্দে সভার বৃদ্ধ সভাপতি জুনিয়র অফিসারদের শোনালেন। মেজরের সেই কাহিনী অনেকে অনেকবার শুনেছে, তবু বরাবরকার মতই সরস লাগল আবারো। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ঝুমরিবাঈ তখনো খুশিতে গর্বে মাঝে মাঝে স্বামীর মুখখানা দেখে নিচ্ছিলেন। এবারে মেজরের কিছু বলার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, আমি এই দীর্ঘদিন ধরে খানিকটা অপরের প্রাপ্য অপহরণ করে আসছি। আজকের বিদায়ের দিনে সেটুকু স্বীকার করে যাওয়াই ভালো–এইমাত্র জীবনের যে ঘটনা– শুনে আপনারা আমাকে অভিনন্দন। জানালেন তার সবটুকু আমার প্রাপ্য নয়।

এ পর্যন্ত বলে তিনি অদূরে ঝুমরিবাঈয়ের দিকে তাকালেন একবার। মিসেস সেবকরামের শঙ্কটাপন্ন অবস্থা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তিনি যেন নীরবে নিষেধ করতে চেষ্টা করলেন। এখানকার হুল্লোড়ের ব্যাপার তিনি জানেন।

কিন্তু মেজর তা দেখেও দেখলেন না, উৎসুক শ্রোতাদের দিকে চেয়ে বলে গেলেন, বয়সকালে একটি মেয়েকে মনে ধরেছিল আমার, তাকে বিয়ে করার জন্য ভিতরে ভিতরে ক্ষেপেই উঠেছিলেন, কিন্তু তখন ফৌজে সেই সামান্য চাকরি করি আর জীবনটা কবে আছে কবে নেই ভেবে সেই মেয়ের বাপ আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি নন। যেদিন আমি ওই কাণ্ড করে আপনাদের কাছে ফেমাস হয়েছিলাম, ঠিক তার আগেই বিয়ের নাকচপত্র এসেছিল। ফলে আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল–এবং যা আমি করে বসেছিলাম সেই মেয়েটিকে না পাওয়ার সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়াতেই বোধ। হয় করতে পেরেছিলাম। অতএব আমার সেই ছেলেমানুষি বীরত্বের সঙ্গে একটি মেয়েরও পরোক্ষ কৃতিত্ব জড়িত ছিল–সেদিনের সেই মেয়েটি উনি–ওই মিসেস সেবকরাম।

হিয়ার হিয়ার! হিয়ার হিয়ার! ওয়াণ্ডারফুল! আরো শুনব! আরো শুনতে চাই আমরা!

আনন্দে খুশিতে সভাস্থল সরগরম। মিসেস সেবকরামের মুখ টকটকে লাল। আনন্দোচ্ছল অজস্র জোড়া দৃষ্টির আঘাতে তিনি ফাঁপরে পড়লেন।

মেজর সেবকরাম গম্ভীর। বললেন, আপনারা আজ আমায় বিদায় দিচ্ছেন, কিন্তু উনি তো দিচ্ছেন না। তাই নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি আর একটি কথাও বলব না।

সভা এইবার মিসেস সেবকরামকে নিয়ে পড়ল। তাঁকেও কিছু বলতেই হবে। বিব্রত বিড়ম্বিত মুখে মিসেস সেবকরামকে উঠে দাঁড়াতে হল। শ্রোতারা উন্মুখ।

মিসেস সেবকরাম বললেন, পুরুষেরা মেয়েদের চিরদিনই নির্লজ্জ তোষামোদ করে থাকেন, মেজরের উক্তি সেই নির্লজ্জতারই চরম নিদর্শন। আসলে কার অপমান বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি সেদিন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই বিচিত্র কাণ্ড করে বসেছিলেন, তার সঠিক প্রমাণ আছে আপনাদের মেজরের গলার ওই হারের লকেটটিতে। আপনারা ওটি দেখলে খুশি হব।

এবারে মেজর বিড়ম্বিত। চারদিক থেকে তরল রব উঠেছে, দেখব, দেখব– উই মাস্ট সি!

সভাপতি হাত বাড়াতে নিরুপায় মেজরকে গলা থেকে হারটা খুলে দিতে হয়। তারপর সেই লকেটসুদ্ধ হার সকলের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সকলের মুখেই। শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম।

লকেটের পিছনে সুন্দর করে খোদাই করা ভারতের মানচিত্র, তার মধ্যে ভারতমাতা দাঁড়িয়ে।

পার্টি শেষ হতে গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটেছে। পিছনের সীটে মেজর এবং মিসেস সেবকরাম দুজনে দুধারে বসে। মাঝখানে ফুলের বোঝা। তাঁদের ছদ্ম গাম্ভীর্যে ফাটল ধরছে মাঝে মাঝে। আড়ে আড়ে এক-একবার দুজনেই দুজনকে দেখে নিচ্ছেন।

ফুলের আড়াল দিয়ে একখানা হাত মিসেস সেবকরামের হাতে ঠেকল। ড্রাইভারের অলক্ষ্যে তিনিও ঈষৎ আগ্রহেই হাতখানা ধরলেন।

গাড়ি নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে।

.

এবারে বহুকালগত মেজরের জীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনাটি ব্যক্ত করলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ হতে পারে।

সেই নতুন বয়সে মেজর সেবকরাম ছিলেন এক তোপখানার হাবিলদার মেজর। হাবিলদার মেজর থেকে হওয়া আর মন্ত্রী দপ্তরের আরদালী থেকে মন্ত্রী হওয়া প্রায় একই পর্যায়ের বিচিত্র ব্যাপার। মেজর সেবকরাম তাই হয়েছিলেন।

ইংরেজ আমলে তোপখানার তিনি সিপাই হয়ে ঢুকেছিলেন। খাওয়া পরা ছাড়া। তখন মাইনে ছিল মাসে আট টাকা। অল্প লেখাপড়া জানতেন, সাহেবী আমলের ভাঙা ইংরেজী বলায় তার সুনাম ছিল। আর ছিল প্রচুর

উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ফলে ওপরের অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। সিপাই থেকে নায়েক হয়েছেন, নায়েক থেকে হাবিলদার এবং সেই অল্প বয়সেই হাবিলদার থেকে মেজর। মাইনে তখন অলফাউণ্ড কুড়ি টাকা–তাদের পর্যায়ে সেদিনের। মস্ত চাকরি। হাবিলদার মেজর নিজের ইউনিটের জোয়ানদের মধ্যে সর্বেসর্বা। তাঁকে ডিউটি ভাগ করে দিতে হয়, জোয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। জোয়ানেরা যেমন সমীহ করত তেমনি ভালও বাসত তাকে। মোট কথা সেই অল্প বয়সেই জোয়ানদের আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণচূড়ায় উঠে বসেছিলেন হাবিলদার মেজর সেবকরাম।

কিন্তু এই উন্নতির তেমন কদর ছিল না শুধু ঝুমরির বাবার কাছে।

সেবকরাম ফৌজে চাকরি করে, বছরের ছুটিতে একবার মাত্র দেশে আসে, কোনো গণ্ডগোল বাধলে কোথায় কোথায় চলে যেতে হবে জামাইকে–এইসব ভেবে ঝুমরির বাবার এই বিয়ে মনঃপূত ছিল না। তার থেকে ফলের ব্যবসায়ী প্রভুজীর ছেলেকেই বেশি পছন্দ তার।

ঝুমরি সেবকরামের পড়শিনী, ছেলেবেলা থেকে ভারী ভাব দুজনের। বড় হয়ে ফৌজে ঢোকার ফলে সেবকরাম ভেবেছিলেন তার কদর বাড়ল। কিন্তু উল্টো ব্যাপার দেখে তার চক্ষুস্থির। পারলে তক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দেন। কিন্তু ফৌজের চাকরিতে একবার ঢুকলে ছাড়তে প্রাণান্ত। ঝুমরির বাবাকে চিঠিপত্রে অনেক বোঝালেন তিনি। ওদিকে ঝুমরিবাইও দোটানায় পড়লেন, গোলামী করতে যাওয়াটা তার আদৌ পছন্দ ছিল না। তাছাড়া বাপও ন্যায্য কথাই বলছেন মনে হল, বিয়ের পরেও তো জীবনের অর্ধেক ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকা।

কর্মস্থলের প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে মায়ের লেখা ওদের শেষ জবাব পড়লেন সেবকরাম। মা লিখেছেন, ওরা শেষ পর্যন্ত এই বিয়েতে রাজি হল না।

চিঠি পড়ে সেবকবামের দুনিয়া রসাতলে পাঠানোর আক্রোশ। পায়ে পায়ে তিনি চললেন টেন্ট-এর দিকে।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে এক নতুন ক্যাপ্টেন এসেছেন তখন। গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়েই তিনি তাকে কম্যাণ্ডিং অফিসার–অর্থাৎ এই ইউনিটের সর্বাধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউনের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করছিলেন। জোয়ানদের ভালোভাবে জেনে বুঝে পরিচালিত করার সুবিধে হয় এরকম কোনো বই আছে কিনা খোঁজ করছিলেন। নতুন উৎসাহী ক্যাপ্টেনটি।

লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউন জবাব দিলেন, আছে কিন্তু তার কিছু দরকার নেই। জাস্ট গিভ দেম এ কিক অন দি ব্যাক অ্যাণ্ড দে উইল ডাই ফর ইউ! অর্থাৎ পিছনে একটি করে লাথি কসাবে, তাহলেই তারা তোমার জন্যে প্রাণ দেবে।

ঠিক সেই সময়েই সেবকরাম তাঁদের পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন কানে আসতে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কম্যাণ্ডিং অফিসারের জবাব শুনে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলেন। তারা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে।

পিছন থেকে আচমকা এক বিপুল পদাঘাতে তিন হাত দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন। নবাগত ক্যাপ্টেন বিমূঢ় হঠাৎ। কম্যাণ্ডিং অফিসার মটি থেকে উঠে দেখলেন পিছনে কে দাঁড়িয়ে।

সেবকরাম শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, ইউ মিন হি সুড কিক দিস ওয়ে সর? অর্থাৎ, কি এইভাবে লাথিটা মারতে বলছেন কে?

কম্যাণ্ডিং অফিসারের কোমরে রিভলভার থাকলে হয়ত তক্ষুনি সব শেষ হয়ে যেত। তার হাতে ছিল একটা স্টিক। তাই নিয়েই বাঘের মত সেবকরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর লপটা-লপটি দুজনে।সেবকরামের কপাল ফেটেছে, কম্যাণ্ডিং অফিসারেরও নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটে গেল। তারপরেই লোকজন ছুটে এলো। সেবকরামকে অ্যারেস্ট করা হল, নিরস্ত্র করা হল।

এরপর কোর্ট মার্শাল। যুদ্ধের সময় হলে এই অপরাধে সেবকরামের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে জানা কথাই।

কোর্ট মার্শাল শুরু হল। আইন অনুযায়ী নিচু পর্যায়ের তিনজন ভারতীয় অফিসার ও থাকবেন। তারা চেষ্টা করতে লাগলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যদি বারো-চৌদ্দ বছরে এনে দাঁড় করানো যায়। এদিকে এই বিচারে আসামী নিজেরও একজন সমর্থক বা আইনজ্ঞ দাঁড় করানোর রীতি। যত টাকা খরচ হোক, সরকার তাকে আসামীর ইচ্ছানুযায়ী এনে দিতে বাধ্য।

সমর্থক প্রসঙ্গে সেবকরাম তার প্রিয় অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর শরণাপন্ন হলেন। চতুর ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী আবার এক ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেলকেই এনে দাঁড় করালেন সেবকরামের হয়ে সওয়াল করার জন্য–এমন লোক বাছাই করলেন যাঁর সঙ্গে ওই অফিসার কমাণ্ডারের খুব সদ্ভাব ছিল না। এই ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেল এসেই হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন, প্ররোচনার কারণ থাকলে কবে কোথায় কোন ইংরেজ সৈনিক অফিসারকে লাথি মেরেছিল তার নজির বার করলেন। অফিসার কম্যাণ্ডার অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা অস্বীকার করেননি। সেটাই তো প্ররোচনা! নিপুণ সুদক্ষ কর্মী সেবকরামের দেশপ্রীতির জন্য শাস্তি না। হয়ে তার পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে গলা ফাটালেন তিনি।

হুলস্থুল বেধে গেল এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অফিসার কম্যাণ্ডারের সম্মান রক্ষার্থেই কোর্ট মার্শালে মাত্র একমাস কারাদণ্ড হল সেবকরামের। হাবিলদার মেজরের পদমর্যাদা অবশ্য গেল, দণ্ডের মেয়াদ ফুরালে আবার সিপাই থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে তাকে।

ওদিকে সেবকরামের দেশে পর্যন্ত নানাভাবে পল্লবিত হয়ে এই খবর চলে গেছে। সেখানে তিনি বারের আসন লাভ করেছেন। ঝুমরিবাঈ ঘোষণা করেছেন, জেল থেকে। বেরুলে সেবকরামকেই বিয়ে করবেন তিনি। তার বাবা এবারে হৃষ্টচিত্তে সায় দিয়েছেন।

জেল থেকে বেরিয়েই সেবকরাম দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে সেই কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন যাঁকে তিনি পদাঘাত করেছিলেন। দুজনে দুজনকে দাঁড়িয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। সাহেব এগিয়ে এসে তার সঙ্গে হ্যাঁণ্ডশেক করলেন। হেসে বললেন, আমার মাজায় এখনো ব্যথা আছে!

নিজে কাধ ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে বহাল করলেন, আর তক্ষুনি আবার হাবিলদার মেজরের পদে প্রমোশন দিলেন তাকে।

বিয়ে কর্মস্থলেই হল। কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন বউ দেখতে এলেন। এসে এক ফাঁকে খুশী হয়ে বউকে বললেন, বি কেয়ারফুল; হি ক্যান কিক্ ওয়েল!

হাবিলদার মেজর সেবকরাম সলজ্জে হেসে এই প্রথম ক্ষমা চাইলেন তার কাছে। বললেন, সাহেব, সেই দিন ঝুমরির বাবা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এই দেখো বলে গলার লকেটটা তাকে উল্টে দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন, সেই ব্যথার ওপর তুমি আরো কোথায় ব্যথ্যা দিয়েছিলে দেখো- এই দেশ যে আমার প্রাণ সাহেব! সাহেবের দুই চক্ষু চকচক করছিল। একবার ঝুমরিকে দেখছিলেন তিনি, একবার কেরামের গলার লকেটটা।

এরপর কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন ক্রমশ অনেক ওপরে উঠেছেন, পুরোদস্তুর কর্নেল হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অলক্ষ্য থেকে সেবকরামকেও টেনেছেন। সকলে অবাক হয়ে দেখেছে–হাবিলদার মেজর সেবকরাম হঠাৎ ভাইসরয়েস কমিশনড় অফিসার হয়েছেন একদিন– লেফটেনেন্ট হয়েছেন। তারপর প্রশস্ত রাস্তা, লেফটেনেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর। এর অনেক আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। কর্নেল ব্রাউন বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে তিনি এঁদের সঙ্গে দেখা করে যেতে ভোলেননি। সেই পুরনো ঠাট্টাও করেছেন মিসেস সেবকরামের দিকে চেয়ে, হি কি ওয়েল–দ্যাট ওয়ান ব্রিলিয়ান্ট কিক ব্রট বোথ ইউ অ্যাণ্ড মি নিয়ারার–ডোন্ট ইউ এগ্রি উইথ মি ম্যাডাম?

সৈনিক

www.bengaliebook.com

অপর্ণা এবারে সত্যিই চলল তাহলে! অনেক দিন যাবে যাবে করেছে, অনেক দিন বলেছে সময় হয়ে এলো। মেজর ঘোষ চৌধুরী এ-কানে শুনে ও-কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন। অপর্ণা উপেক্ষা ভেবেছে কিনা কে জানে! সদা ব্যস্ত স্বামীর কান মন সজাগ নেই ভাবত কিনা কে জানে! নইলে অত করে বলত কেন?

ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি রেড রোডে পড়তেই স্পিডের কাটা তিরিশ থেকে এক লাফে পঁয়তাল্লিশের দাগে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে কাটা কেউ দেখছে না। মেজর ঘোষ চৌধুরী ঘড়ির কাঁটা দেখলেন একবার। বেলা চারটে বাজতে দশ। রাস্তা ফাঁকা। কতক্ষণ আর লাগবে। যাবেন আসবেন। এই জন্যেই আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন। প্রতিটা মুহূর্তের অনেক দাম এখন। মরণ-বাচনের দাম। জীবনের একটাই মিনতি রাখা না-রাখার দাম। না, একটানা তেত্রিশ বছরের যুক্ত জীবনে অপর্ণার আর কোনো প্রার্থনা বা মিনতি এই মুহূর্তে অন্তত মনে পড়ছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর। অপর্ণা বলেছিল, তুমি এত ব্যস্ত, তাই ভয় হয়। শেষ সময়ে কাছে থেকো, নইলে ভয়ানক খারাপ লাগবে আমার–থাকবে তো?

একবার নয়, অনেকবার করে বলেছিল। এই গত পরশুও বলেছিল। কালও একবার বোধহয় বলতে চেষ্টা করেছিল। আর আজ সকাল থেকে মুখে বলতে না পারুক হঠাৎ-হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছিল তিনি আছেন কিনা।

চোখদুটো ভয়ানক চকচক করছে মেজর ঘোষ চৌধুরীর। অথচ ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। কঁচাপাকা লোমশ দুই পরিপুষ্ট হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকল। হুইস্কির ছোট বোতল বেরুলো। দাতে করে মুখ খুললেন। রাস্তাটা ফাঁকা, তাছাড়া কে দেখল না দেখল পরোয়া করেন না। দরকার বলেই খাচ্ছেন। মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না, চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না। সময়ের অনেক দাম এখন। হাত শক্ত, স্নায়ু সবল রাখা দরকার। ছোট বোতল উপুড় করে গলায় ঢাললেন খানিকটা। অর্ধেকের বেশিই খালি হয়ে গেছে গত দু-ঘণ্টার মধ্যে। সাধারণত বেশি খান না। দুদিন ধরে বেশিই খাচ্ছেন। দুদিনে এরকম চারটে ছোট বোতল খালি। হয়ে গেল…না, দিস ইজ দি ফোর্থ, খালি হতে চলেছে!

দাঁতে করে বোতলের মুখ আটকে আবার পকেটে রাখলেন। স্পীডের কাটা প্রায় পঞ্চাশ ছুঁয়ে আছে। একটু আধটু কমছে, আবার পঞ্চাশের কাছে দাঁড়াচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর। এজন্যেই আর কাউকে না পাঠিয়ে তিনি নিজে ছুটেছেন। আর্মিতে তার দুরন্ত গাড়ি ছোটানো দেখে কত লোকের তাক লেগে যেত। তিনি গাড়ি চালাবেন শুনলে ভয়ে অনেকে সে-গাড়ি এড়াতে চাইত।

...সেই অপর্ণা সত্যিই চলল তাহলে!

মেজর ঘোষ চৌধুরীর মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা। কি কাণ্ড করেই না তিনি ঠিক-ঠিক ঘরে এনে ছেড়েছিলেন তাকে। অথচ এরই মাঝে কিনা তেত্রিশটা বছর কেটে গেল!

আবার দুচোখ চকচক করছে, আবার একটু একটু ঝাপসা দেখছেন। সেই সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসও।...তেত্রিশ বছর আগের নয়, মাত্র সেদিনের দৃশ্য যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে।

...ডাক্তারী পড়ার চতুর্থ বছর সেটা। পড়ার চাপ বেশি। একটা পাঁচমিশিলি নামী হস্টেলে থাকতেন। জানালা খুললেই পড়ায় ব্যাঘাত হত। অথচ না খুলেও পারতেন না। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ীর মেয়ে অপর্ণা। নাম আরো দেড় বছর আগেই জানেন। তার যখন ডাক্তারীতে ফোর্থ ইয়ার, অপর্ণার তখন কলেজের থার্ড ইয়ার। সেই সময়ে গণ্ডগোলটা হল। এমন নতুন কিছুই করেননি। সেদিন চতুর্থ বছরের ডাক্তারী নবিশ ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরী রোজকার মতই মাঝে মাঝে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, অন্য দিনের মতই মৃদু মৃদু হেসেছিলেন চোখাচোখি হতে। বাড়তির মধ্যে আভাসে। হয়ত বা কথা বলার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন।

ব্যস, অপর্ণা ঠাস করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অপর্ণার মারমুখী দাদা-কাকারা হস্টেলে এসে হাজির হয়েছিল। অন্য ছেলেরা তার হয়ে তুমুল বচসা করেছিল। আর তার কান দিয়ে আগুন ছুটেছিল। সেইদিনই ডাকে তিনি অপর্ণার নামে চিঠি ছেড়েছিলেন। সার

কথা, একদিন তাকে তাদের বাড়ীতে তার ঘরে আসতেই হবে। ইচ্ছে হলে একথা সে তার বাবা মা দাদা কাকাদের জানিয়ে দিতে পারে।

মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসছেন একটু একটু। ওই রকম গোঁয়ারই ছিলেন বটে। জানালায় এরপর আর খুব বেশি দাঁড়াতেন না। হঠাৎ একদিন কানে এলো–অপর্ণার বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে। পড়াশুনা সিকেয় উঠল তার। মাথায় আগুন জ্বলল। একটা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বাড়ীর দূর-সম্পর্কীয় এক লোকের মারফৎ বার করলেন। কোথায় বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে। ঠিকানাও সংগ্রহ করলেন। তারপর উড়ো চিঠি ছাড়লেন।–অপর্ণা এবং একটি ছেলে পরস্পরকে বিয়ে করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ। অতএব ছেলের অন্যত্র বিয়ে করাই ভালো।

বিয়ে ভেঙে গেল। কারণও একেবারে গোপন থাকল মা হয়ত। কারণ দিনকতক বাদেই অপর্ণাকে হস্টেলের এই ঘরের দিকে চেয়ে তাদের জানালায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আর ধীর পদক্ষেপে তিনিও নিজের জানালায় এসে দাঁড়ালেন। নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলেন তিনিই এই ব্যবস্থা করেছেন।

পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি হস্টেল ছাড়লেন। রেজাল্ট বেরুলো। ভালো পাস করলেন। অপর্ণা জানেও না তিনি কি পড়তেন বা কোথায় চলে গেলেন।

অভাবিত একটা ভালো সম্বন্ধ পেলেন অপর্ণার বাবা-মা একজনের মারফৎ। সেই একজন ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরীরই লোক সে আর কে বলতে গেছে। তারা জানালেন, বড়ঘরের ছেলে, বরাবর ভালো রেজাল্ট করে ডাক্তার হয়েছে।

মিথ্যে জানলেন না তারা।

অপর্ণার বাবা নিজে এলেন খোঁজখবর করতে। এই ভদ্রলোক দেড় বছর আগের বিবাহের ঘটনা কিছুই জানেন না। তার সবই ভারী পছন্দ হল। এত সহজে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে আশা করেননি। ছেলের বাবা-মায়ের উদারতা দেখে তিনি মুগ্ধ। ছেলে দেখেও খুশি। মুখখানা চেনা চেনা লাগল।

ফলে বাবা বলেই দিলেন, ছেলের পছন্দ বলেই তিনি এগোচ্ছেন, ছেলে মেয়ে দেখেছে–উল্টোদিকের হস্টেলই ছেলে থাকত।

জানাজানি হওয়া সত্ত্বেও বিয়েতে বিঘ্ন হল না। আর তারপর কটা দিন কি কাণ্ড! দুচোখ চকচক করছে মেজর ঘোষ চৌধুরীর, কিন্তু অল্প অল্প হাসছেনও।...বিয়ের পর অপর্ণা তার দিকে আর চোখ তুলে যেন তাকাবেই না, এমন অবস্থা।...সব যেন সে দিনের কথা মাত্র।

পিচের রাস্তা ঘষটে ঘ্যাঁচ করে থামল গাড়িটা। লাল আলো জ্বলে উঠেছে রেড লাইট! গলা দিয়ে অস্ফুট একটা বিরক্তির শব্দ বার করলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। সবুজ না হওয়া পর্যন্ত থাকো বসে! আরো অসহিষ্ণু বোধ করলেন তিনি, কারণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে-দিকটার লাইন ক্লিয়ার–সেই রাস্তায় একটি গাড়ি আসছে না বা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সময় ধরে রোড সিগন্যাল পড়ে, এ-দিক বন্ধ তো ও দিক খোলা, ওদিক বন্ধ তো এ-দিক।

পকেটে হাত। হুইস্কির বোতল। খুললেন। গলায় ডাললেন। বন্ধ করে ওটা পকেটে রাখার অবকাশ পেলেন না– সবুজ আলো! বোতল পাশে পড়ে থাকল। গাড়ি ছুটল।

...সময় নেই।

আর্মিতে চাকরি নিতে অপর্ণা ঘাবড়েছিল। অনেক নিষেধ করেছিল, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার জন্য ঝকাঝকি করেছিল, তার ভয় তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বদাই ও যে একটা চাপা আতঙ্কে ভুগত সেটা তিনি টের পেতেন। সিভিল পোস্টিং হলে তবু স্বস্তি, সঙ্গে থাকত বলে অত ছটফট করত না। ইমারজেন্সি এরিয়ায় বদলী হলেই অপর্ণার আহার-নিদ্রা ঘুচত যেন। এই জন্যেই অসময়ে পূজো-আর্চা ধরেছিল বলে বিশ্বাস। মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসতেন, আবার বিরক্তও হতেন।...লেফটানেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয়েছেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, তবু অপর্ণার ভয় ঘোচেনি। সে ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিকমত মানুষ করে তুলেছে, তার প্রতি সকল কর্তব্য করেছে আর সেই সঙ্গে একটা অহেতুক ভয় পুষেছে।

www.bengaliebook.com

আশ্চর্য, দৈব বিড়ম্বনায় অসময়ে আর্মি। থেকে অবসর নিতে হল তাকে, তবু অপর্ণার ভয়ে ভয়ে থাকাটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথর পড়ে পা ভাঙার ফলে আর্মির চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাকে। মেজর ঘোষ চৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন, ঠাকুর তোমার ডাক শুনেছে, মিলিটারির চাকরি ছাড়িয়েছে!

অপর্ণার নির্বাক চাউনিটা স্পষ্ট মনে আছে। দুচোখে জল টলমল করছিল।

.

গাড়ি থামল। এই দোকানই। নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। পরক্ষণে আরো বেগে ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন। মুখ শুকনো, চোখের নিমেষে গাড়ি ওধারের বড় রাস্তার দিকে ঘোরালেন।

.

..অপর্ণা চললই তাহলে! বড় দোকানে ওষুধ মিলল না। মিলবে কিনা সন্দেহ ছিলই। পাওয়া গেলেও অপর্ণা থাকবে কিনা সন্দেহ–ডাক্তার তো তিনিও, আর নামী ডাক্তারই–সবই বোঝেন। তবু আশা, শহরের সব থেকে নামজাদা ডাক্তার বলেছেন, এই ওষুধটা একটা কেসএ জাদুর কাজ করেছিল–পান কিনা এক্ষুনি দেখুন। ওমুক জায়গায় যান—

সেই জন্যেই টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাঁচিয়ে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়েছেন। আর কারো ওপর নির্ভর করতে পারেননি। ওষুধটা কোথাও থাকলে তাকে পেতে হবে। ওদিকের বড় রাস্তা ধরে গেলে আরো দুটে দোকান আছে।

কিন্তু ওদিকটায় আবার ট্রাম বাস মোটর চলাচলের ভিড়। তার ফাঁক দিয়েই বেগে। ছুটেছে। এই ওষুধটার জন্য তিনি যেন সর্বস্ব দিতে পারেন। টাকার তো অভাব নেই, অভাব যার ঘটতে চলেছে টাকা দিয়ে তা পূরণ হবে না।...অপর্ণা রাগই করত, সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই–তোমার এত টাকার কি দরকার?

মিলিটারি চাকরির যা পেনশন পান, সেদিকে তাকানোও দরকার হয় না তার। যে টাকা তিনি প্র্যাকটিস করে রোজগার করেন, তা কল্পনার বাইরে। সেই এক আট টাকা ভিজিট করে রেখেছেন তিনি–তাই রোগী আসে কাতারে কাতারে। প্রায় তিন বেলাই হিমসিম অবস্থা হয় তাঁর। বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে চেম্বার। কিন্তু খোঁড়া মেজরের কাছে রোগী আসে পাঁচ সাত মাইল দূর থেকেও। পা জখম হবার পর থেকে একটু খুঁড়িয়ে চলেন বলে রোগীদের মুখে মুখে এখন এই নাম।

ওয়ার্থলেস!

মুখ বিকৃত করে চার রাস্তার মুখ সবেগে পার হবার মুখেই ঘ্যাচ করে গাড়িটা থামাতে হল। লাল আলো। ভ্রূকুটি করে ওধারের রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন তিনি, গ্রীন পেয়ে এখনো নড়তেও শুরু করেনি। এই ফাঁকে অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারতেন। বাবুরা সব গদাই লস্করি চালে গাড়ি চালায়।

ঘন ঘন লাল আলোর দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। অসহিষ্ণু হাতে পাশের হুইস্কির বোতল ট্রাউজারের পকেটে ঢোকালেন। গায়ে তো শুধু পুরু গেঞ্জি একটা।

.

সর্বদা অত ভয়ে ভয়ে থাকত বলেই একে একে হার্টের দুদিকেরই ভালব খারাপ হয়ে গেল কিনা অপর্ণার, মেজর ঘোষ চৌধুরীর এখন সেই সন্দেহ হয়। শয্যা নিয়েও তার দুশ্চিন্তা যায় না তার জন্য। ঘড়ি ধরা সময়ে খেতে না এলে বা সময়ে শুতে না এলে বিছানায় শুয়েই ছটফট করবে। ছেলেরা আর মেয়েরা অনেকবার সেই নালিশ করেছে। আর এখন তো মুখে কেবল এক কথা, শেষ সময়ে তুমি যেন কখনো আমার কাছছাড়া হয়ো না, কাছে থেকো–থাকবে তো?

মেজর ঘোষ হেসেছেন, শেষ সময় অত সস্তা নয়, বুঝলে?

–তবু তুমি কথা দাও- কথা দাও না গো!

কথা দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার তবু ভয় যায় না দেখে বিছানার গায়ে। টেলিফোন এনে দিতে হয়েছে। একটু খারাপ বুঝলেই অপর্ণা চেম্বার থেকে ডাকবে তাঁকে।

মা-কে বাবার এই কথা দেওয়ার খবরটা ছেলেমেয়েরাও কি করে যেন জেনেছে। মায়ের অসুখ বাড়বাড়ির দিকে গড়াবার আগে তারা এই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে। টেলিফোন হাতে পেয়ে ওদের মা যেন পরীক্ষা করার জন্যেই এ পর্যন্ত দিনতিনেক ডেকেছে তাকে।

গ্রীন লাইট। গাড়ি ছুটল।

.

দ্বিতীয় বড় দোকানেও নেই। চললই তাহলে অপর্ণা। মিথ্যেই দুর্বল হচ্ছেন তিনি, ওষুধ পেলেও যাবেই। তবু অন্য দোকানটাও দেখতে হবে। সময় নেই।...বাড়ির সঙ্গে কানে একটা টেলিফোন লাগানো থাকলে বুঝি ভালো হত। বাকি বড় দোকানটা দেখেই সোজা বাড়ি। তিনি কথা দিয়েছেন পাশে থাকবেন, সে-কথা যে কি-কথা সেটা এখন। অনুভব করছেন। যে অবস্থায় দেখে কেঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছেন–আর দেরি করা ঠিক হবে না।

আশ্চর্য! অপর্ণা কি তাহলে থাকবে এ-যাত্রা? ওষুধ পেয়েছেন। তিনি তো ডাক্তার, জীবন-মন্ত্র ভাবছেন নাকি এটা? ওষুধ হাতে পাবার পর আশাও তেমন করতে পারছেন কই? এই অবস্থা থেকেও ফেরে কেউ? সত্যি মিরাকল হয়?

এবারে আরো বেগে ছুটেছেন।

..খাইয়ে তো দেবেন, যেমন করে হোক কিছুটা পেটে যাওয়া চাই। চাই-ই।

ইমপসিবল! ইমপসিব! বিরক্তিতে অসহিষ্ণুতায় গলা দিয়ে জোরেই শব্দ বার করে ফেললেন মেজর ঘোষ চৌধুরী।

লাল আলো। অর্থাৎ থামো।

www.bengaliebook.com

অথচ মাত্র দুটো সেকেণ্ডের জন্য বোধহয়। প্রথম সাদা দাগ ছাড়িয়েই এসেছিলেন। দ্বিতীয় দাগটা ছাড়াতে পারলেই আর থামতে হত না। কিন্তু তার আগেই সবুজ আলো হলদে হয়েছে, তারপর লাল। ও-ধারের রাস্তার গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে এমন কি হলদে আলো সবুজ হবার আগেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু কি আর করা যাবে! পিছনের দিকে দেখে নিয়ে দ্বিতীয় সাদা দাগের কাছ থেকে গাড়ি বরং হাতকয়েক পিছিয়ে নিতে হল।

..এ-রকম হয় না কেন, যে রাস্তায় গাড়ি যাবে সে রাস্তায় শুধু যাবেই, যে রাস্তায় আসবে, শুধু আসবেই–চার রাস্তা থাকবে না–এস রোড থাকবে না।

মাথা গরম হয়েছে বোধহয় তাঁর, কিন্তু এখানে বোতল খোলা মুশকিল।

নাকের ডগা দিয়ে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, সেগুলিকে ভস্ম করার চোখ মেজর ঘোষ চৌধুরীর।

আশ্চর্য, অপর্ণা যে তার এতখানি এ কি নিজেই জানতেন! পাশে থাকতে কথা দিয়েছেন যখন, তখনও কি জানতেন? তখনো কি এরকম করে অনুভব করতে পেরেছিলেন?

ক্রস রোডে গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। এক মিনিট এত বড় হয় কি করে?

…তবু তুমি কথা দাও, কথা দাও না গো!

কথা যখন দিয়েছিলেন, তখনো কি সেই আকৃতি এমন করে শিরাতে শিরাতে ওঠা-নামা করেছিল তার? তিনি তো তার পরেও লোকের চিকিৎসা নিয়ে সদা ব্যস্ত ছিলেন, এমন দম-আটকানো শূন্যতা তো কখনো অনুভব করেননি?

….চিকিৎসার বাইরে আর সকল দিক অপর্ণা এ-ভাবে ভরাট করে রেখেছিল বলেই অনুভব করেননি। তাই বটে। কোনদিন আর কোনদিকে

তাকানোর দরকারই হয়নি তার! দুটো মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বড় ছেলেটার বিয়ে হয়েছে, আর একটা ছেলেও আগামী বারে ডাক্তারী পাস করে বেরুবে। এরা সব ছোট থেকে হঠাৎ চোখের ওপর দিয়ে কেমন করে যে বড় হল, যোগ্য হল, তাও যেন ভালো জানেন না মেজর ঘোষ চৌধুরী। সব-দিক এমনিই ভরে রেখেছিল বটে অপর্ণা। তেত্রিশ বছরের এই ভরাট দিকটাই শূন্য হওয়ার দাখিল। তাই সবদিকই শূন্য। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট। চোখে ভয়ানক ঝাপসা দেখছেন।

বিষম চমকে উঠলেন– সবুজ আলো! গ্রীন! ব্লেসেড গ্রীন!

হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটল। আশ-পাশের গাড়িওয়ালারা তাঁর গাড়ির এই গতি পছন্দ করছে না। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে ভাবছে। হলেই হল। মিলিটারি চাকরিতে কোন পথ দিয়ে কি স্পীডে গাড়ি চালাতে হয়েছে তা কে জানবে কি করে। চকচকে চোখ, কিন্তু ঠোঁটে আবার যেন হাসির আভাস একটু–জানলে অপর্ণা বোধহয় সুস্থ শরীরেই হার্টফেল করত। নির্ভয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর দুটো চোখ আর সবগুলো স্নায়ু একত্র করেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিচ্ছেন তিনি। গাড়িতে বসলে তার খোঁড়া পা আর খোঁড়া থাকে না–ওনলি ডোন্ট ডিসটার্ব মি: এনিবডি অ্যাণ্ড লেট দেয়ার বি নো রেড লাইট এনি মোর!

.

বাড়ি।

সিঁড়ির গোড়ায় পা রেখেহে নিশ্চল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। কানে গলানো শিসে ঢুকল এক ঝলক। ঝলকে ঝলকে ঢুকছে। তিনি নিস্পন্দ কাঠ।

দোতলার ওই অনেক গলার আর্তনাদের একটাই অর্থ।...অপর্ণা থাকল না। গেলই।

কয়েক নিমেষের মধ্যে বুঝি বুড়িয়ে গেলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। এত বুড়িয়ে গেলেন যে সিঁড়ির শেষ নেই মনে হচ্ছে। ঝকঝকে দুচোখে মুক্তোর

মত দুটো কি। হাঁপ ধরছে। দাঁড়ালেন। কি যেন একটা ভুল হয়ে গেছে।...কি? মাথার ভিতরে এরকম লাগছে কেন? তিনি ডাক্তার, জানতেনই তো অপর্ণা থাকবে না!

পকেটের বোতলটা উবুড় করে নিঃশেষে গলায় ঢাললেন।

দোতলা। অপর্ণা শুয়ে আছে। মেয়ে দুটো আর ছোট ছেলেটা আছড়া-আছড় করে কাঁদছে। বড় ছেলে, ছেলের বউ কাঁদছে। জামাইরা কাঁদছে।

তাকে দেখেই ছোট ছেলে আর্তনাদ করে উঠল, বাবা, তুমি আর একটা মিনিট দেড়টা মিনিট আগে এলে না? আর একটু আগে এসে কথা রাখতে পারলে না বাবা? যাবার দশ সেকেণ্ড আগেও মা যে চোখ তাকিয়ে চারদিকে খুঁজল তোমাকে?

মেজর ঘোষের এইবার মনে পড়েছে। তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পাশে থাকবেন। কি আশ্চর্য, তিনি কি পাশে ছিলেন না এতক্ষণ?

অপর্ণার দিকে তাকালেন। ঘুমুচ্ছে যেন। হাসি-মাখা ঘুম। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করবেন তার? বলবেন, শোনো অপর্ণা, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমিও তাই চেয়েছিলাম–চেয়েছিলাম!

নির্বাক, বোবা তিনি।

ঘণ্টাখানেক বাদে কান্নার প্রাথমিক আবেগ স্তিমিত হল। জামাইরা দেহ নেবার যোগাড়যন্ত্রে বেরিয়েছে। দুই ছেলে শিয়রে আর পায়ের কাছে বসে। পাশে তিনি।

ধরা-গলায় এক সময় বড় মেয়ে বলল, আর একটু যদি আগে আসতে বাবা...মায়ের কাছে তুমি শেষ কথাটা রাখতে পারলেই না......!

ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখে মেজর ঘোষ চৌধুরী আস্তে আস্তে বললেন, হবার নয় বলেই হল না রে,...তিন-তিনবার রাস্তার লাল আলোয় আটকে গেলাম–বড় ক্রসিং, এক মিনিট করে থামতে হল। যাবার সময় অন্য রাস্তায় একটাও

গাড়ি নেই, অথচ লাল আলো, আর আসার সময় একেবারে বেরিয়ে মুখে-মুখে দুবার।

বড় ছেলে বেশ জোরেই বলে উঠল, বেরিয়ে আসার মুখে তো বেরিয়েই এলে না কেন? কে কি করত? বড় জোর একশ দেড়শ টাকা জরিমানা হত–এর বেশি আর কি হত?

মেজর ঘোষ চৌধুরী হতভম্ব বিমূঢ় হঠাৎ। বেরিয়ে আসা যেত ঠিকই। অনায়াসেই যেত। আর একশ দেড়শ টাকা ছেড়ে কথা রাখার জন্য এক হাজার দু হাজার দশ হাজারও বার করে দিতে আপত্তি ছিল না তার। কিন্তু লাল আলো দেখেও বিধি নাকচ করে ওভাবে বেরিয়ে আসা যেতে পারে সেটা মাথায়ও আসেনি তার। এখনো যেন ভালো করে আসছে না।

ছেলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মেজর ঘোষ, চৌধুরী।

www.bengaliebook.com